অলংকরণ: নির্মলেন্দু মণ্ডল

উপন্যাস

জ্যোৎস্নাপুজো

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

ট্রেন ছাড়তে আর পাঁচ মিনিটও দেরি নেই। এখনও আপার বার্থের প্যাসেঞ্জার এল না। উসখুস করে কুশল। অন্য যে-কোনও যাত্রী হলেও করত। দূরপাল্লার ট্রেনের সহযাত্রীকে নিয়ে সকলেরই একটু উৎকণ্ঠা থাকে। মানুষটা কেমন হবে? ঝগড়ুটে কিংবা কোনও বিরক্তি উদ্রেককারী অভ্যেস আছে কি না? যদিও পাল্লা খুব দূরের নয়, একরাত্রি অর্ধেক দিনের মামলা। এটুকু সময় যে-কারওর সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে নেওয়া যায়। রাতটা তো ঘুমিয়ে কেটে যাবে, যদি না আপার বার্থের লোকটি নাক ডাকে। হাল্কা করে ডাকলে অবশ্য সমস্যা হবে না। জোরে নাক ডাকা একেবারেই সহ্য করতে পারে না কুশল।

PujaABP B/W F6(Page 85-100=16 Pages)

শার্টের পকেটে মোবাইল ফোন বেজে উঠল কুশলের। রিংটোনটা খুবই রেয়ার, একটু বিচিত্র ধরনেরও। লোকজন ঘুরে তাকায়। এখনও তাকিয়েছে তার সাইড বার্থের মুখোমুখি কুপের মেয়েটি, যে পরে আছে গোলাপি-কমলা জংলা ছাপ কামিজ আর ঢোলা সাদা সালোয়ার। বয়স পঁচিশের মধ্যেই, চোখে থতমত বিস্ময়। কুশল তড়িঘড়ি ফোনসেটটা পকেট থেকে বের করে সুইচ টেপে। স্ক্রিন দেখার প্রয়োজন নেই। জানে কার ফোন।

"বলো বাবা?"

"ছাড়ল ট্রেন?"

বাবার প্রশ্নের সঙ্গে-সঙ্গে হাতঘড়ি দেখে কুশল, সাড়ে আটটা। ট্রেনটা ছাড়ার এটাই এগজ্যাক্ট টাইম।

বাবার উৎকণ্ঠা প্রশমিত করতে কুশল বলে, "এইবার ছাড়বে। দু'চার মিনিট লেট তো হয়ই। ছাড়লে ফোন করব তোমাকে।"

ওপ্রান্তে বাবা ফোন রেখে দেওয়ার পর চকিতে একবার উল্টোদিকের মেয়েটিকে দেখে নেয় কুশল। ও কি টের পেল, তিরিশ পেরনো এক প্যাসেঞ্জারের ট্রেন ছাড়ল কি না খোঁজ নিচ্ছে কেউ?

সম্ভবত পায়নি। গুরুত্ব দেয়নি আর কি। পরিবারের সঙ্গে গল্পে মেতেছে। এটা এসি টু-টায়ার কম্পার্টমেন্ট। কুশলের সামনে চারটে বার্থে মেয়েটি এবং তার বাবা, মা, ভাই। ওদের কথোপকথনে জানা গিয়েছে মেয়েটির নাম মুন্নি, ভাই বাপ্পা। আন্দাজ করাই যায় এগুলো ওদের ডাকনাম। মুন্নি যথেষ্ট সুন্দরী এবং এ ব্যাপারে সে যথেষ্ট সচেতন। খুব কমবারই তাকিয়েছে কুশলের দিকে। প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপে ছিল আকস্মিকতার অজুহাত, অর্থাৎ তুমি চোখে পড়ে গেলে, তাই দেখে ফেলতে হল। একমাত্র ফোনটা বেজে ওঠার সময় মুন্নি বিস্ময়সহ দৃষ্টি থামিয়েছিল। এভাবে নজর কাড়াটা মোটেই পছন্দ হয় না কুশলের, অপরিচিত পরিমণ্ডলে ফোনসেট ভাইব্রেট মোডে রাখে। ট্রেনে ওঠার পর রাখতে ভুলে গিয়েছিল। রিংটোনটা তার এতটাই পছন্দের, উড়িয়ে দিতে মন চায় না। সেটটা পকেট থেকে বের করতেই দুলে উঠল ট্রেন।

জানলার কাচে চোখ লাগায় কুশল, পিছিয়ে যাচ্ছে প্ল্যাটফর্ম। আপার বার্থের প্যাসেঞ্জার এল না। পরের স্টপে হয়তো উঠবে। কামরা পুরোপুরি রিজার্ভড, জানে কুশল। তার নিজের আরএসি ছিল, গতকাল কনফার্ম হয়েছে বার্থ। উপরের প্যাসেঞ্জার না ওঠা পর্যন্ত অস্বস্তিটা রয়ে গেল।

কুশল ফোনের স্ক্রিনে মন দেয়, এমন সময় পাশে ঝপাস করে কী যেন পড়ল। প্রথমে শব্দের দিকে চোখ যায়, একটা রুকস্যাক। তার পর দৃষ্টি গেল লাগেজের মালিকের দিকে, ব্লু জিন্স, মেরুন পাঞ্জাবি পরিহিত এক যুবতী। রীতিমতো হাঁপাচ্ছে।

ভীষণ চমকে দিয়ে কুশলের উদ্দেশে মেয়েটি বলে ওঠে, "খুব চিন্তা করছিলে? এক্সট্রিমলি সরি। মৌলালির কাছে এমন জ্যামে পড়লাম না...জল আছে তো তোমার কাছে? বোতল কেনার সময়ই পেলাম না।"

মেয়েটি হাত বাড়িয়েছে। অর্থাৎ জল খাবে এখনই। কুশল বোঝে, মেয়েটির কোথাও ভুল হচ্ছে। কস্মিনকালে মেয়েটিকে সে দেখেনি। আপাতত তৃষ্ণার্তকে জল দেওয়া যাক। পরে ভুল ভাঙানো যাবে। নিজের জলের বোতল লাগেজ থেকে বের করাই ছিল, বোতলটা মেয়েটির হাতে তুলে দেয় কুশল।

ছিপি খুলে জল খেতে থাকে সে। কুশলের চোখ যায় সামনের কুপের মেয়েটার দিকে, কপাল কুঁচকে দেখছে কুশলের সহযাত্রিনীকে। একটু বেশি সময় ধরেই দেখছে।

"থ্যাঙ্ক ইউ," বলে তৃপ্তির হাসিসহ বোতল ফেরত দেয় জিন্স-পাঞ্জাবি। সৌজন্যবশত কুশলের মুখেও হাসি চলে আসে। বোতল নিয়ে সিটের দেওয়ালে লাগানো নেটের ব্যাগে রাখে। এবার মেয়েটার ভুল ভাঙানো দরকার। মুখ ঘুরিয়ে কুশল দেখে, সহযাত্রিনী নিজের রুকস্যাক থেকে স্লিপার বের করে মেঝেতে রাখল। সিটে বসে স্নিকার খুলছে। এবং তার সঙ্গে বকবক করে যাচ্ছে।

"কলকাতার রাস্তাঘাটের এখন যা অবস্থা, আধঘণ্টায় যেখানে হেঁটে চলে যাওয়া যায়, গাড়িতে তার চেয়ে বেশি সময় লাগছে," কথা থামিয়ে মেয়েটি কুশলের সমর্থন চায়, "ঠিক কি না বলো?"

মাথা হেলাতে গিয়েও সামলে নেয় কুশল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভুলটা ভাঙাতে হবে। মেয়েটি লাগেজ থেকে আরও কীসব যেন বের করছে। কুশলের দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করে, "ডিনার সেরে এসেছ তো? রাতের ট্রেন, ভাল কিছু পাওয়া যাবে না কিন্তু।"

এবারও নিরুত্তর থাকে কুশল। মেয়েটার চোখ নাক মুখ বেশ শার্প। চোখটা এখনও দেখা যাচ্ছে না। চুলের গোছা আড়াল করছে। গায়ের রং পাকা ভুট্টাদানার মতো। টাওয়েল আর এক সেট কাপড়জামা বের করেছে মেয়েটি। কুশলের উত্তরের প্রত্যাশা তার নেই।

নিজেই বলতে থাকে, "অফিস থেকে বেরিয়েই আমি ডিনার সেরে নিয়েছি। ওখানেই একগাদা সময় নষ্ট হল।"

কথা শেষ করে মেয়েটি করিডোর ধরে এগিয়ে গেল। বাথরুমে যাবে নিশ্চয়ই। এখনও ভুল ভাঙানো হল না মেয়েটার। কিন্তু এতক্ষণ ধরে ভুলটা করে যাচ্ছে কী করে, এটা ভেবেই ভারী আশ্চর্য হয় কুশল! ওর বোধহয় অন্য কোনও বার্থে রিজার্ভেশন, যেখানে অপেক্ষা করছে মেয়েটার সত্যিকারের সহযাত্রী। উৎকণ্ঠায় আছে সে। আর ইনি এতই বাচাল, কুশলের দিকে একবার তাকিয়েই বকবক করে যাচ্ছে। এইসব মেয়েদের কপালে অশেষ দুঃখ লেখা থাকে।

কুশল ফের তাকায় উল্টোদিকের বার্থের মেয়েটার দিকে। চোখাচোখি হয়। কুশলের ভুল সহযাত্রীর কারণেই বুঝি সালোয়ার-কামিজ এখন তাকানোর ব্যাপারে বেশ অকৃপণ হয়েছে। রূপের অহংকারে সামান্য ঘাটতি দেখা দিয়েছে সম্ভবত। চোখ সরিয়ে নিয়ে কুশল মুন্নি বাবা, মা, ভাইয়ের দিকে তাকায়, শোওয়ার বন্দোবস্ত করছে ওরা। রেলের দিয়ে রাখা বেডরোল পেতে নিচ্ছে বার্থে। রাতের দিকে ট্রেন বলে বেশির ভাগ যাত্রী ডিনার করে উঠেছে, ইতিউতি দু'-একজন রাংতার ফয়েল খুলে খাবার খাচ্ছে। এরা হয়তো অনেকদূর থেকে এসে ট্রেন ধরেছে শিয়ালদায়। বন্ধ দরজা-জানলার কারণে যে-কোনও গন্ধই এসি কামরা জুড়ে ঘুরপাক খায়। কুশল সহজে আন্দাজ করতে পারছে, যারা এখন ডিনার সারছে, তাদের বেশির ভাগই অবাঙালি। আচার, ঘিয়ের গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। যেটা অনুমান করা এখন সমস্যা হচ্ছে, কুশলের নিকটবর্তী দুই সহযাত্রীর মধ্যে কে বেশি সুন্দরী? মুন্নির মধ্যে একটা লক্ষ্মীমন্তভাব আছে। খুব ফর্সা। আর জিন্স-পাঞ্জাবি শার্প, সাবলীল অ্যাটিটিউড। ব্যক্তিত্বে মুন্নির চেয়ে অন্তত দশ নম্বর বেশি। কুশল নিজের আঠারো-কুড়ি বছর বয়সের কথা ভাবে, সে সময় ট্রেনে দূরে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যান হলেই মনে-মনে প্রার্থনা করত, কাছাকাছি যেন একজন সুন্দরী সহযাত্রী থাকে। সেই সুন্দরীকে নিয়ে কল্পনার যাত্রাপথ তৈরি করত কুশল। দু'-চারবার সেরকম সুন্দরীর সঙ্গে দেখা হয়েছে। একজনের সঙ্গে আলাপ পর্যন্ত গড়িয়ে ছিল। কুশলের অনুৎসাহে খুব তাড়াতাড়ি সম্পর্কে ইতি পড়ে যায়। ভ্রমণের বাইরে কলকাতার স্থিরভূমিতে দেখা করে মেয়েটিকে আর ভাল লাগেনি কুশলের। ভ্রমণ তো আসলে একটা ঘোর তৈরি করে দেয়, সব কিছুই ভাল লাগে তখন। তবে কুশলের কাছাকাছি থাকা এখনকার দুই যাত্রী প্রকৃতই সুন্দরী, এরা স্থিরভূমিতেও পুরুষকে বিহ্বল করতে সক্ষম। কপাল খারাপ কুশলের, সেই আবেগতাড়িত বয়সটা চলে গিয়েছে। এখন আর কোনও সুন্দরীর সঙ্গে যেচে আলাপ করার আগ্রহ হয় না। দূরযাত্রায় প্রত্যাশা থাকে না কোনও সুর্দশনার। এই অবেলায় জুটল তো জুটল, একসঙ্গে দুটো! অনেকেই বলবে, 'অবেলা' আবার কী! তিরিশ কোনও বয়স নাকি? কুশলও সেটা মানে। তবে কিনা এই বয়সে এসে আর মনে হয় না, পৃথিবীর সব রূপসীর সঙ্গেই আমার কিছুদিনের জন্যে হলেও, প্রেম হওয়ার কথা ছিল। কারও-কারও মাথায় ভূতটা অবশ্য চেপে থাকে অনেকদিন। কুশলের নেই। তাই দুই সুন্দরীর সান্নিধ্যে খুব একটা উৎসাহিত হতে পারছে না। জিন্স পরিহিতার বার্থ যে এটা নয়, বোঝা যাচ্ছে। ভুল ভাঙার পর সে চলে যাবে অন্য কোনও বার্থে।

মেয়েটা এখনও আসছে না কেন? অনেকক্ষণ হল বাথরুমে গিয়েছে। লাগেজ কুশলের জিম্মায়। উল্টোপাল্টা কিছু নেই তো ওর মধ্যে? একটু ঝুঁকে কুশল মেয়েটির যাওয়ার রাস্তার দিকে তাকায়, নাঃ, এখনও দেখা নেই। করিডোরে চলাচল করছে জল, কোল্ড-ড্রিঙ্কস বিক্রেতা। ট্রেনের গতি কমছে, দক্ষিণেশ্বর চলে এল মনে হচ্ছে। বাবা বলেছিল এই স্টেশনে নাকি দাঁড়ায়।

কুশল যাচ্ছে ডুয়ার্সের বীরপাড়ায়। মামার বাড়ি। জায়গার নাম বীরপাড়া হলেও, স্টেশনের নাম দলগাঁও। এ এক অদ্ভুত রহস্য! ছোটবেলা থেকে এই প্রশ্নটা নিয়ে ঘুরছে কুশল, আজ পর্যন্ত কোনও সদুত্তর পায়নি। প্রায় বিশ বছর পর বীরপাড়ায় যাচ্ছে কুশল। ক্লাস সিক্সে মা মারা যাওয়ার পর একবারই ছোটমামার বিয়েতে বাবার সঙ্গে এসেছিল। তারপর আর আসা হয়নি। মা না থাকার কারণেই মামাবাড়ির সঙ্গে বন্ধনটা শিথিল হয়ে গিয়েছে। বড়মামা অবশ্য কলকাতায় গেলে অতি অবশ্যই কুশলদের বাড়িতে একবার ঢুঁ মারে। একমাত্র ভাগ্নের প্রতি বড়মামার একটা আলাদা টান আছে। মামা হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েছে, এখন-তখন অবস্থা। কুশলকে খুব দেখতে চায়। মামার ছেলে পল্টু ফোন করে এক সপ্তাহ আগে একথা জানালে, কুশল বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে ট্রেনের টিকিট কাটে।

ট্রেন পুরোপুরি থেমে গিয়েছে। কুশল ঝুঁকে পড়ে কাচের বাইরে স্টেশনটা দেখতে যায়, এমন সময় কে যেন ডাকে, "অ্যাই, শোনো একবার।"

বুক চলকে ওঠে কুশলের, গলাটা চেনা। আসছে করিডোর থেকে। ঘুরে তাকায় কুশল, যা আশঙ্কা করছিল তাই, মেয়েটি তাকেই ডাকছে। পরনে এখন নাইট ড্রেস, ঢোলা পাজামা, শার্ট।

"কী হল, এসো না একবারটি," ফের ডাকে মেয়েটি। ভ্রম এখনও কাটল না। এমন ঠায় তাকিয়ে আছে, উঠতেই হয় কুশলকে। মুন্নি সমেত আশপাশের দু'-একজন যাত্রীও কৌতূহলী দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছে মেয়েটির দিকে।

কুশল মেয়েটির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। মাথা একপাশ করে মেয়েটি বলল, "একটা দুল কোথায় যে হারাল বুঝতে পারছি না। ট্রেনের টয়লেটে গেল, নাকি আগেই হারিয়েছে, বুঝতে পারছি না। টয়লেট ভাল করে খুঁজলাম...," এরপর মাথা নাড়ল মেয়েটি। অর্থাৎ পায়নি।

কুশলের চোখ চলে যায় মেয়েটার বাঁ কানের লতিতে, দুল নেই। বেঁধানোর চিহ্ন আছে। গভীর আক্ষেপে মেয়েটি সরাসরি তাকাল কুশলের মুখের দিকে। ডান কানের দুলটা এখন দেখা যাচ্ছে, সোনার দুল, মাঝে একটা মুক্তো। সেটটা যদি ঝুটো না হয়, তাহলে অনেক টাকা ক্ষতি হয়েছে। অপরিচিত হলেও, সদ্য জলেভেজা মেয়েটার করুণ মুখটার দিকে তাকিয়ে কুশলেরও খারাপ লাগে। কিন্তু তার কী-ই বা করার আছে? একটাই চিন্তা হচ্ছে, মেয়েটা তাকে দুলটা খুঁজতে টয়লেটে পাঠাবে না তো?

দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে ট্রেন এখন বালিব্রিজে উঠেছে। চারপাশে এখন ব্রিজ পেরনোর গুমগুম আওয়াজ।

মেয়েটা হঠাৎ নিচু স্বরে বলে ওঠে, "বিপদে পড়ে অ্যাস্কিংটা করে যেতে হচ্ছে। প্লিজ সাপোর্ট দিয়ে যান। আমার নাম নীলা। আপনার?"

শিরদাঁড়া শক্ত হয়ে যায় কুশলের। ভয় মিশ্রিত বিস্ময়ে জানতে চায়, "বিপদ মানে?"

"দুটো লোক আমাকে ফলো করছে। সুযোগ পেলেই হামলা করবে। যদি দেখে দু'জন আছি, সহজে সাহস করবে না। নামটা বলুন। কথা চালাতে সুবিধে হবে," একদমে বলে গেল মেয়েটা। একটু ইতস্তত করে কুশল টাইটেলসহ নিজের নামটা বলল। পদবি না বললেও হয়তো চলত, আসলে নার্ভাসনেস। এ কী ধরনের ঝামেলায় পড়ল রে বাবা! গল্প, সিনেমায় এসব সিকোয়েন্স ভালই লাগে। বাস্তবে যে ঘটে না, তা নয়। কিন্তু কুশলের সাদামাটা জীবনে এ ধরনের রহস্যজনক উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি অপেক্ষা করছিল, ভাবতেই অবাক লাগছে তার।

দুল হারানোর বিমর্ষতা নিয়ে নীলা এগিয়ে চলল করিডোর ধরে, কুশল তাকে অনুসরণ করে। ব্রিজ পার হয়ে গেলে ট্রেন। কুশলের খারাপ লাগছে একটা কথা ভেবে, মেয়েটা নিজেকে বাঁচানোর জন্য একেবারেই অযোগ্য একজনকে বেছে নিল। কোনও ধরনের হামলা যদি হয়, কুশল মোটেই ঠেকাতে পারবে না। জীবনে কখনও মারপিট করেনি সে। ছোটবেলায় খেলাচ্ছলে করে থাকতে পারে, স্মৃতিতে নেই। সামান্য কথা-কাটাকাটিও কুশল সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে চলে। এখানে আবার হামলাবাজ একসঙ্গে দু'জন। কুশলের চেহারাটাও এসব ব্যাপারে অ্যাডভান্টেজ হিসেবে দেখা দেবে না। সে যথেষ্ট লম্বা হলেও, রোগাটে গড়ন তার। চোখেমুখে নমনীয়, বিনম্র ভাব। তার উপর আবার চশমা। মানুষজন তাকে খানিকটা অনুকম্পার দৃষ্টিতেই দেখে, কিন্তু হামলাবাজদের কাছে এই দাক্ষিণ্য আশা করা অন্যায়।

বার্থে এসে বসল নীলা। কুশলও বসে। মুন্নিদের পরিবার তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। নীলা হঠাৎ কেন ডাকল, সেটাই নিশ্চয়ই বুঝতে চায়।

রুকস্যাক খুলে হ্যান্ডব্যাগ বের করল নীলা, ডান কানের দুল খুলতে-খুলতে বলতে থাকল, "তুমি গিফ্‌ট করেছিলে বলেই বেশি আপসোস হচ্ছে। কোথায় যে পড়ল..."

মুন্নির মা আর ধৈর্য রাখতে পারল না। জিজ্ঞেস করে বসল, "কী হয়েছে?"

প্রশ্নটা দু'জনের উদ্দেশেই, উত্তর দেওয়ার ভার নিল নীলা। বলল, "আর বলবেন না মাসিমা, টয়লেটে ফ্রেশ হয়ে মুখ মুছে দেখি, বাঁ কানের দুলটা নেই!"

"ট্রেনে ওঠার আগে ছিল?" জানতে চাইল মুন্নির মা।

নীলা বলল, "সে কী আর খেয়াল করেছি, এখন দেখছি নেই। কোথায় খুঁজি এখন বলুন তো!"

"সোনার?" প্রশ্নকর্তা একই ব্যক্তি।

হ্যান্ডব্যাগে দুলসুদ্ধু হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিল নীলা, বের করে আনে। দুলটা মুন্নির মায়ের হাতে দিয়ে বলে, "অরিজিন্যাল। গড়িয়াহাট থেকে কেনা।"

গয়নাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে মুন্নির মা। বলে, "তাহলে তো অনেক দাম! টয়লেটটা ভাল করে দেখেছ? প্যাঁচটা হয়তো আলগা ছিল, মুখ ধুতে গিয়ে খুলে গিয়েছে।"

"ভাল করেই দেখেছি। সেই জন্যই তো এত সময় লাগল," বলল নীলা।

মুন্নির বাবা বলে ওঠে, "তোমার টাওয়েলটা একবার দেখে নাও তো। মুখ মোছার সময় হয়তো আটকে গিয়ে থাকবে।"

প্রস্তাবটা মনে ধরে নীলার, কোলের ওপর রাখা টাওয়েলটা তুলে দেখতে থাকে খুঁটিয়ে। কুশলেরও কেন জানি মনে হয় জিনিসটা ওখানেই পাওয়া যাবে।

পাওয়া অবশ্য গেল না। টাওয়েলটা ভাল করে দেখার পর দু'বার ঝেড়ে নিয়ে নীলা ঠোঁট উল্টে বলল, "না, নেই।"

খুবই হতাশ হল কুশল। জোড়া সমস্যা তার পক্ষে বড্ড চাপের হয়ে যাচ্ছে, প্রথমত, দুষ্কৃতীরা টার্গেট করেছে মেয়েটাকে, তার উপর সে আবার সোনার দুল হারিয়ে বসে আছে। কুশল মনেপ্রাণে চাইছিল, একটা ঘটনার অন্তত নিষ্পত্তি হোক।

মুন্নির মা দুলটা নীলাকে ফেরত দিয়ে দেয়।

ফোন বেজে উঠল কুশলের। বিচিত্র রিংটোনের কারণে নীলা হকচকিয়ে তাকাল, মার খেল অভিনয়। কুশল পূর্বপরিচিত হলে, রিংটোন শুনে এতটা চমকানোর কথা নয়। ব্যাপারটা সম্ভবত লক্ষ করেনি মুন্নি, ফোন বেজে উঠতে সে-ও তাকিয়েছিল কুশলের দিকে।

ফোন কানে কুশল বলে, "হ্যাঁ, এইমাত্র ছাড়ল। তোমাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম।"

"এত লেট করল কেন?" ওপ্রান্ত থেকে জানতে চাইল বাবা।

"ঠিক বুঝতে পারলাম না। কোনও অ্যানাউন্সমেন্ট নেই।"

"কো-প্যাসেঞ্জাররা কেমন? উল্টোপাল্টা লোক নেই তো?"

বাবার প্রশ্ন শেষ হতেই কুশলের চোখ আপনা থেকেই চলে গেল নীলার দিকে। মুখে বলে, "ঠিক আছে। কোনও অসুবিধে নেই।"

"এবার তাহলে শুয়ে পড়ো। চেন-তালা দিয়ে লাগেজটা বেঁধে নিও। ঘুম থেকে ওঠার পর ফোন কোরো একটা।"

"করব," বলে ফোন অফ করে কুশল।

নীলা হ্যান্ডব্যাগ থেকে আর-একটা দুলের সেট বের করেছে, গাঢ় লাল পাথরের সেটা। দুলটা কানে পরতে-পরতে ভুরু নাচিয়ে কুশলকে জিজ্ঞেস করে, "কে, মাসিমা?"

নীলার আন্দাজে ছোড়া ঢিল লক্ষ্যভ্রষ্ট হল, জানতে চাইছে কুশলের মা ফোন করেছে কি না। অনুমানটা অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক, একমাত্র মায়েদেরই হুঁশ থাকে না, সন্তানের বয়স তিরিশ পেরিয়ে গিয়েছে। ব্যাকুলতা কাটতে চায় না। নীলার প্রশ্নে অবশ্য ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়েছে কুশল। এরপর নীলা যেটা করল সেটা ভারী অস্বস্তিজনক। সে চটি খুলে পা তুলে দিয়েছে বার্থে। পা দুটো ছুঁয়ে আছে কুশলের কোমর। ওর ব্যাগ থেকে একটা ম্যাগাজিন বের করে ঠেস দিল সিটের দেওয়ালে।

ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাতে-ওলটাতে কুশলকে বলতে থাকল, "কাল তোমাকে মোবাইলে না পেয়ে অধৈর্য হয়ে ল্যান্ডে ফোন করলাম। মাসিমা ধরেছিলেন। কিছু বলেছেন নাকি?"

অভিনয় দক্ষতা কোনওদিনই ছিল না কুশলের। কতক্ষণ নীলাকে সাপোর্ট দিতে পারবে জানে না। অধ্যায় সংক্ষিপ্ত করতে আপাতত দু' পাশে মাথা নাড়ে। একই সঙ্গে টের পায় তার মুখটা ভ্যাবাচাকা টাইপ হয়ে গিয়েছে।

এক বয়স্ক মানুষ কুশলদের বার্থের দিকে একটু বেশি সময় তাকিয়ে, এগিয়ে গেলেন করিডোর ধরে। নীলা ফের বলে ওঠে, "ওফ, মাসিমা যা সব প্রশ্ন করছিলেন না, আমি তো পুরো নার্ভাস। কতদিন ধরে চাকরি করছ কুশলের অফিসে? তোমার ডিউটি টাইম ক'টায়? তোমাকেও কি নাইট শিফ্‌ট করতে হয়? আরও নানা প্রশ্ন। আমি কোনটার কী উত্তর দিয়েছি মনে নেই। পরে যখন দেখা হবে..."

বকেই যাচ্ছে নীলা। কুশল অনেক চেষ্টা করে মুখটা হাসি-হাসি করে রেখেছে, যেন বসে আছে স্টুডিওতে, এখনই পাসপোর্ট-সাইজ ফোটো তোলা হবে। এক্সপ্রেশনের কোনও বদল ঘটাতে পারছে না, মুখে কথাও আসছে না কিছু। মুন্নির বাবা, ভাই উল্টোদিকের আপার বার্থে শুয়ে পড়েছে। মুন্নির মা, মুন্নি এখনও শোয়নি, বই পড়ার ভান করে শুনে যাচ্ছে নীলার কথা। মাঝেমধ্যে আড়চোখে কুশলদের বার্থের দিকে দেখছে। এভাবে বেশিক্ষণ চালানো যাবে না। কুশল ধরা পড়ল বলে। একটা জিনিস কিছুতেই কুশল বুঝতে পারছে না, এত কথা বলে নীলা খামকা কেন পরিস্থিতি জটিল করছে? হামলা করতে পারে এমন কাউকেই তো কাছাকাছি দেখা যাচ্ছে না। এইসব প্রহসন তো ওদের জন্যেই। নাকি তারা আশপাশের বার্থেই আছে? কুশল তো তাদের চেনে না। বিপদ হয়তো খুব কাছেই। ঠিক কতটা সংকটজনক অবস্থায় তারা আছে, বুঝে উঠতে পারছে না কুশল। নীলার বকবকানিতে আরওই গুলিয়ে যাচ্ছে সব। ওকে দেখে কে বলবে, বিপদটা আসলে ওর!

যে-বয়স্ক ভদ্রলোক করিডোর ধরে এগিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি ফিরে যাচ্ছেন এখন। আবারও ভাল করে দেখলেন কুশল আর নীলাকে।

"কী, ঠিক বলেছি না?" অনেক কথার পরে জিজ্ঞেস করল নীলা।

ওর কথা শোনা অনেকক্ষণ আগেই বন্ধ করে দিয়েছে কুশল। ঠেকা দেওয়ার জন্য বলে, "হ্যাঁ, ঠিকই তো।"

মুখে ম্যাগাজিন চাপা দিল নীলা, হাসি ওর চোখে। অপ্রস্তুত বোধ করে কুশল, ঠিক-টা কি ভুল জায়গায় বলে ফেলল? চোখ গেল মুন্নির দিকে, সে-ও বইয়ের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসছে। এবার দুই মেয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসি বিনিময় করল। অর্থাৎ কুশল হল পুরো খোরাক। তাতে অবশ্য কিছু যায় আসে না। কিশোর বয়স থেকেই মেয়েদের কাছে 'খোরাক' হওয়ার অভ্যেস কুশলের আছে। কিন্তু এরকম একটা সিরিয়াস সিচুয়েশনে ঠাট্টা-তামাশার আবহাওয়া তৈরি করা কি ভাল? প্রতিমুহূর্তে সজাগ থাকা উচিত। হামলা কখন কোনদিক থেকে আসবে কোনও ঠিক নেই। একে তো রাতের ট্রেন, আশপাশে কোনও রেলপুলিশও দেখা যাচ্ছে না।

মোটাসোটা এক ভদ্রমহিলা ক্রস করে গেলেন কুশলদের বার্থ। ইনিও একটু সময় নিয়ে কুশল, নীলাকে দেখলেন। এঁরা কী যে দেখছেন, বোঝা যাচ্ছে না। মুন্নিরাও নজর করে যাচ্ছে। সম্ভবত কোথাও একটা বেমানান ব্যাপার আছে কুশল আর নীলার মধ্যে। নীলা চেষ্টা করছে সেটা ঢাকতে, কুশলের আড়ষ্টতার জন্যই সম্ভব হচ্ছে না।

"আমাদের লাইটটা নেভালে ভাল হয়। তোমরাও শুয়ে পড়ো এবার," আপার বাঙ্ক থেকে বলল মুন্নির বাবা। মুন্নি ওদের দিকের একটা সুইচ অফ করে দেয়। একটা আলো-আঁধারি পরিবেশ সৃষ্টি হল। আজকের মতো শেষ হতে চলল প্রহসন। বেশির ভাগ কুপের আলো নিভে গিয়েছে, পর্দা টেনে দিয়েছে যাত্রীরা। কুশলদেরটা নিয়ে করিডোরের চারটে লাইট জ্বলছে। রাতের দিকে বিপদ বাড়বে না কমবে, বুঝে উঠতে পারছে না কুশল। ঘুম যে হবে না, এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকা যায়।

মোটাসোটা মহিলা ফিরে যাচ্ছেন, এবার নীলাকেই শুধু খুঁটিয়ে দেখলেন। নীলা অবশ্য ওঁর অবলোকনকে গ্রাহ্যই করল না।

পেটের উপর ম্যাগাজিনটা ঝপাস করে রেখে বলল, "সেনগুপ্ত যা টার্গেট দিচ্ছে, নেক্সট টু ইমপসিব্‌ল। তোমাকে কোনও টেনশন করতে দেখছি না, কী ব্যাপার বলো তো? সেনগুপ্তর সঙ্গে অফিসের বাইরে কোনও অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়েছে নাকি?"

"না না, সেরকম কোনও ব্যাপার নয়। টেনশন করলেই টেনশন বাড়ে। বেকার নিজের উপর চাপ বাড়িয়ে কী লাভ!"

কুশলের কথার পরেই ফিক করে হেসে ফেলল নীলা। মেয়েটা বেয়াড়া রকমের ফাজিল। কুশল ঠিকঠাক সঙ্গত করতে পেরেছে বলেই ওর এত খুশি। কথাটা আসলে কুশল নিজেকেই বলেছে, তাই এরকম স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলতে পারল।

মুন্নি হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে নীলাকে বলল, "আপনার ম্যাগাজিনটা একটু দেখব?"

"ওঃ, শিওর, প্লিজ," বলে নীলা পত্রিকাটা বাড়িয়ে ধরল মুন্নির দিকে।

ম্যাগাজিনটা নিয়ে পাতা ওলটাতে থাকে মুন্নি।

নীলা কপাল কুঁচকে কুশলকে জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা, আমাদের ব্যাপারটা কি সেনগুপ্ত জানে? তুমি কিছু বলেছ?"

ফের থতমত অবস্থা কুশলের। নীলা কেমন ফ্রেমে তাদের সম্পর্কটাকে কল্পনা করেছে, সে জানে না। সম্পর্কটা কতদিনের, কতটা গভীর, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী, কোনও কিছুরই ধারণা করা তার পক্ষে অসম্ভব। শুধু একটা বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে, নীলার কল্পনায় দু'জনে এক অফিসে চাকরি করে। কাজের ধরন এখনও অজানা।

উত্তরের প্রত্যাশা নীলার নেই, কুশলকে বিব্রত করার জন্যই প্রশ্নটা করেছিল। তারপর একটু সময় নিয়ে জানতে চায়, "ডানকুনি কি পেরিয়ে এসেছি? ওখানে তো স্টপ দেওয়ার কথা।"

কুশল খেয়াল করতে পারছে না ট্রেন দাঁড়িয়েছিল কি না। অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন সামাল দিতে গিয়ে হারিয়ে ফেলেছে বাহ্যজ্ঞান।

মুন্নি মুখ তুলে বলে, "ডানকুনি অনেকক্ষণ চলে গিয়েছে। স্টপ দিয়েছিল।"

"যাঃ, এখানে আমার পিসির বাড়ি। দেখা হল না। কতদিন আগে এসেছি," নীলার গলায় আক্ষেপের সুর। ঝুঁকে পড়েছে জানলার কাছে। পিসির বাড়ি যদি স্টেশনের কাছেও হয়, এই রাতে দেখতে পাওয়ার কথা নয়।

জানলার কাচে চোখ ঠেকিয়ে নীলা বলে, "কোথায় এলাম বলো তো? বর্ধমানের কাছাকাছি চলে এলাম কি?"

এলে কী সুবিধে, জানে না কুশল। তবু জানলার কাছে চোখ নিয়ে যায়। নীলার পায়ে যাতে চাপ না লাগে, সে ব্যাপারেও সাবধান থাকতে হচ্ছে। বাইরে অন্ধকারমাখা বাড়িঘর, গাছপালা, মাঠ। বর্ধমান এখান থেকে কত দূরে কুশলের পক্ষে আন্দাজ করা সম্ভব নয়। এই লাইনে তার নিয়মিত যাতায়াতও নেই।

হঠাৎ শোনে নীলার ফিসফিসে স্বর, "অ্যাক্টিংটা কিন্তু একদম হচ্ছে না। স্কুল, কলেজে কোনওদিন নাটক-ফাটক করেননি নাকি?"

ভর্ৎসনা গায়ে না মেখে সরাসরি প্রসঙ্গে আসে কুশল। চাপাস্বরে বলে, "হামলাবাজদের তো কাউকে দেখলাম না।"

"আছে। এখান দিয়ে পাস করেছে কয়েকবার। আমি এমনই-এমনই বকে যাচ্ছি না।"

কুশল মনে করার চেষ্টা করে তাদের বার্থের সামনে দিয়ে যাতায়াতকারীদের। খুব বেশি লোক যায়নি। সবাইকে মনে রাখাও অসম্ভব। রেলের পোশাক পরা দুই জলওয়ালাকে সন্দেহ হচ্ছে এখন। তাদের চেহারা তেমন তাগড়াই নয়, সঙ্গে অস্ত্র থাকলে অবশ্য চেহারা ম্যাটার করে না।

"একটা কথা বলব?" জানলার কাচে চোখ রেখে অনুমতি চাইল নীলা।

"বলুন।"

"আপনি বোধহয় সামনের বার্থের মেয়েটাকে অনেকটাই ইমপ্রেস করে এনেছিলেন। আমি এসে কেসটা গড়বড় করে দিলাম।"

"এরকম মনে করার কারণ?"

"আপনার কমফর্ট লেভেল দেখে। ভীষণ শেকি ফিল করছেন। কেমন একটা অপরাধী-অপরাধী ভাব। এতক্ষণ ধরে আশা জাগিয়েছেন..."

এর কী উত্তর দেবে ভেবে পায় না কুশল। বাইরের অন্ধকার দেখতে থাকে।

ফের নীলাই নিচুগলায় বলতে থাকে, "মেয়েটাকেও আমার বেশ ডিসঅ্যাপয়েন্টেড লাগছে। ইট্‌স আ রিয়্যাল লাভার্স এক্সপ্রেশন। আই অ্যাম রিয়েলি ভেরি সরি। আই মাস্ট টেক কেয়ার অফ অর রিপেয়ার ইয়োর্স ব্লসমিং রিলেশন।"

"আপনার অ্যান্টিসিপেশনে ইমাজিন্যাশনের ভাগটা বড্ড বেশি," জুতসই কথাটা বলতে পেরে কুশল মনে-মনে নিজের পিঠটা চাপড়ে নেয়।

নীলার দিক থেকে উত্তর আসে, "থ্যাঙ্ক ইউ। আপনার কমেন্টটাকে আমি কমপ্লিমেন্ট হিসেবে নিলাম।"

কুশল অবাক হয়ে তাকায় নীলার দিকে, মেয়েটাকে কিছুতেই বুঝে ওঠা যাচ্ছে না।

নীলা ফিরে যায় স্বাভাবিক গলায়। জানলা থেকে মুখ সরিয়ে এনে বলে, "কী হল, জামাপ্যান্ট পরেই শোবে নাকি! যাও চেঞ্জ করে এসো।"

"হ্যাঁ, যাই," বলে সিট ছেড়ে ওঠে কুশল। এই টেনশনের জার্নিতে আরাম করে ঘুমনোর কোনও উপায় নেই। ভেবেছিল, যা পরে আছে ওতেই শুয়ে পড়বে। মেয়েটা যখন বলছে, চেঞ্জ করেই নেওয়া যাক।

জুতো ছেড়ে চটি পরেই ছিল কুশল, সিটের নীচ থেকে ব্যাগ টেনে পাজামা-পাঞ্জাবি, টাওয়েল বের করে টয়লেটের দিকে এগোতে যাবে, নীলা বলে, "চশমা পরে চললে যে বড়! দুলটা আবার খুঁজতে বসে যেয়ো না। আমি ভাল করেই দেখেছি।"

অনুগত প্রেমিকের মতো ঘাড় হেলিয়ে প্যাসেজ ধরে এগোতে থাকে কুশল। হামলার ভয়েই কুশলকে তাড়াতাড়ি ফিরতে বলল নীলা। এইটুকু সময়ের জন্য যে ছেড়েছে, সেটা মুন্নিদের উপর ভরসা করেই। কীরকম চট করে আলাপ জমিয়ে নিয়েছে!

টয়লেটে ঢুকে উলটো চিন্তা চলে এল কুশলের মাথায়, ওভাবে লাগেজব্যাগটা ছেড়ে আসা কি ঠিক হল? মুন্নিরা যদি ফট করে পর্দা টেনে শুয়ে পড়ে, ব্যাগ নিয়ে চম্পট দিতে পারে মেয়েটা। ভেস্টিবিউল কামরা, কোথায় যে সেঁধোবে, খুঁজে পাওয়া যাবে না আর। ওর নাম হয়তো নীলা নয়। এরকম তো আকছার ঘটছে।

দ্রুত পোশাক পালটে ফেলল কুশল। তারপরই মনে হল ব্যাগে তো সেরকম জরুরি কিছু নেই। পার্স, মোবাইল নিজের কাছেই আছে। ব্যাগ খোয়া গেলে পোশাক নিয়ে একটু সমস্যা হবে। চামড়ার ট্রলি ব্যাগটারও অবশ্য দাম আছে। তবে মেয়েটির সঙ্গে সামান্য ব্যাগ চুরিটা কেমন যেন মানায় না।

একটু তাড়াতাড়িই টয়লেট থেকে বেরিয়ে এল কুশল। ঘাড়ে-মুখে জল দেওয়া হল না। দুলটা খোঁজার চেষ্টাই করেনি। কেন করবে, সে তো আর সত্যিই উপহারটা দেয়নি।

করিডোরের মুখে এসে কুশল দেখল নীলা পালায়নি। গল্প জুড়েছে মুন্নির সঙ্গে। ওদের মাথার উপরে একটিই সাদা আলো জ্বলছে, বাকি প্যাসেজ জুড়ে নীল আলো, নাইট-ল্যাম্প। সব কুপেই প্রায় পর্দা টানা হয়ে গিয়েছে। ছাড়া পোশাকগুলো হাতে নিয়ে বার্থের কাছে পৌঁছয় কুশল। দুই মেয়ের মধ্যে কে কোথায় থাকে, কোন কলেজে পড়েছে, এইসব নিয়ে কথা চলছে। নীলা এখনই রিলেশন রিপেয়ারিংয়ে নেমে পড়ল নাকি? ব্যাগে কাপড়জামা ঢোকাতে-ঢোকাতে ওদের কথায় কান রেখে কুশল নীলার কলেজের নামটা জানতে পারল, প্রেসিডেন্সি। সাবজেক্ট ইংলিশ। মাস্টার্স করেছে কলকাতা ইউনির্ভাসিটি থেকে। বাড়ির ঠিকানা জানা গেল না। কুশল আসার আগে বলা হয়ে গিয়েছে। মুন্নিও নিজের সমস্ত তথ্য দিয়ে ফেলেছে। জানার কোনও

আগ্রহ নেই কুশলের।

ব্যাগ সিটের নীচে ঢুকিয়ে চেন-তালা মেরে দেয় কুশল, নীলাকে জিজ্ঞেস করে, "তুমি উপরে নাকি নীচেই থাকবে?"

"এখনই শুয়ে পড়বে?" ন্যাকাসুরে বলল নীলা।

সিন আর কিছুতেই লেংদি করতে রাজি নয় কুশল। আড়মোড়া ভেঙে বলে, "হ্যাঁ, এবার শুয়ে পড়ি। ভীষণ টায়ার্ড লাগছে।"

আর কোনও আবদার করল না নীলা। নেমে এল সিট থেকে। আপার বার্থের বেডরোল বিছিয়ে নিতে-নিতে বলল, "আমি উপরেই শুচ্ছি।"

বিছানা পাততে সাহায্য করে কুশল। নীলা কাছে এসে ফের চাপা গলায় বলে, "সত্যিই ঘুমিয়ে পড়বেন নাকি? একটু কশাস থাকলে ভাল হয়।"

আকুতিতে বিপন্নতা প্রবল। কুশল আস্তে করে বলে, "থাকব।"

স্মার্ট টেকনিকে আপার বার্থে উঠে গেল নীলা। মুন্নির সঙ্গে বাই, গুডনাইট বিনিময় করল। কুশলকে বলল, "লাইট অফ করে দাও।"

নিজের বিছানা পেতে সুইচ অফ করে কুশল। চশমা খুলে পর্দা টেনে শুয়ে পড়তেই খেয়াল হয়, মামারবাড়িতে ফোন করা হল না। বড়মামি গতকাল ফোন করে বলেছিল, ট্রেনে ওঠার পর একটা ফোন করে দিস।

মামি কেন কথাটা বলেছিল, কুশল বোঝে। এর আগে বেশ কয়েকবার বীরপাড়ায় যাওয়া নিশ্চিত হয়েও, শেষ পর্যন্ত যাওয়া বয়নি। কোনও না কোনও কাজে আটকে গিয়েছে। ছোটমামার বিয়েতে সেই শেষ যাওয়া। তখন ক্লাস এইট। দাদু মারা গেল কুশলের মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে। শ্রাদ্ধের কাজে যাওয়া হল না। যদিও ততদিনে মামাবাড়ির সঙ্গে দূরত্ব অনেকটাই বেড়েছে। ক্লাস নাইনে কুশলের পৈতের সময় মামাবাড়ির দিক থেকে বড়মামা ছাড়া আর কেউ আসেনি। বাবা বীরপাড়ায় গিয়ে নেমন্তন্ন না করার জন্য এই বয়কট। কার্ড পাঠিয়েছিল বাবা, ফোন করে বলেছিল আসতে। একমাত্র বড়মামা বীরপাড়ার বাড়ির অমতে এসেছিল পৈতেতে। বলেছিল, "আমি অন্নপ্রাশনে ওকে ভাত খাইয়েছি, পৈতেতে যাব না!"

বড়মামা কেন যে তাকে এত বেশি স্নেহ করে, কুশল ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। ছোটবেলায় বীরপাড়ার যে-স্মৃতিটুকু আছে, সেখানে বড়মামার রাশভারী হাবভাবটাই মনে পড়ে। নিজের ছেলেমেয়ের সঙ্গে কুশলকেও যথেষ্ট ধমকধামক দিত। মা মারা যাওয়ার পর যতবার কুঁদঘাটের বাড়িতে এসেছে বড়মামা, কুশলের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে খুব যে কথা বলেছে, তা নয়। অল্পই দু'চার কথা, কেমন আছিস? পড়াশোনা বা অফিস কেমন চলছে? এর সঙ্গে বীরপাড়ার বাড়ির কিছু খবর দিয়ে, ওখানকার জমির ফল, সব্জি রেখে, চা খেয়ে চলে যেত। সব মিলিয়ে একঘণ্টাও হয়তো থাকত না। ওই সময়ের মধ্যে বাবার দেখা পেলে গুটিকয় কথা বিনিময় হত। অপেক্ষা করত না বাবার জন্য। ভাগ্নের সঙ্গে দেখা করতেই আসা। কোনও জাগতিক প্রত্যাশা নেই। মামাবাড়ির আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। তিন মামার কেউই তেমন উঁচুদরের কাজকর্ম করে না। ছেলেমেয়েরাও বিশেষ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবু বড়মামা কখনও কোনও সাহায্য চায়নি বীরপাড়ার সংসারের জন্য। কুশলকে চোখের দেখা দেখে মামার মনের কোন অংশটা যে শান্তি পায়, জানতে ইচ্ছে করে। এটাই হয়তো কুশলের কাছে শেষ সুযোগ। পল্টু বলল, অবস্থা খুবই খারাপ। ফুসফুসে কী একটা ইনফেকশন হয়ে বিছানা নিয়েছে। কোনও ওষুধ কাজ করছে না।

বছর দেড়েক আগে বীরপাড়ায় যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। দিদিমা মারা গিয়েছিল তখন। কাছা পরে নেমন্তন্ন করে গেল বড়মামা। বাবাকে বলল, "কুশলের মধ্যেই তো বেলা আছে, ওর হাতে জল পেলে মা শান্তি পাবে। একটু চেষ্টা কর ওকে নিয়ে শ্রাদ্ধে আসতে।"

মামাবাড়ির উপর বাবা প্রসন্ন না থাকলেও, দিদিমার কাজে উপস্থিত থাকার জন্য দুটো টিকিট কেটে ফেলেছিল। যাওয়ার দু'দিন আগে শরীর খারাপ হল বাবার। ব্লাডপ্রেশারের সমস্যাটা বাড়ল। ওই অবস্থাতেই যেতে চেয়েছিল বাবা, কুশল রাজি হয়নি। মামাবাড়ির কারওর প্রতিই তার বিশেষ কোনও দুর্বলতা নেই, বীরপাড়ার প্রতি একটা আকর্ষণ থাকলেও, সে জানে কিশোরবেলার সেই বীরপাড়া কালের নিয়মে এখন অনেকটাই বদলে গিয়েছে। বেশির ভাগ বাড়িই ছিল টিনের চালের, পাথর দিয়ে তৈরি দেওয়াল। ওখানে ইটের চেয়ে পাথর সস্তা। নুড়ি ফেলা রাস্তা। দু'পাশে মাঠ, চাষের জমি, বিশাল প্রাচীন গাছ, কুয়াশা আটকে থাকে তাতে। প্রত্যেক বাড়ির হাতায় অল্প পরিচর্যায় প্রচুর ফুল। চালে লাউ, কুমড়ো। ছোট্ট বাগানে বিভিন্ন সব্জি। মামাবাড়ির বাগান ছিল বেশ বড়, শেষ অংশটা পাশের পাড়ায়। বড়মামা কুঁদঘাটের বাড়িতে এসে বলেছে, মামাতো বোনদের বিয়ে দিতে সেই বাগানের প্রায় পুরোটাই বিক্রি হয়ে গিয়েছে। বড়মামার এক মেয়ে, এক ছেলে। মেজোর দুই মেয়ে। ছোটমামারও একটি করে ছেলে মেয়ে। মেয়ে বড়, হায়ার সেকেন্ডারি দেবে বোধহয়। শেষের ভাইবোনদের চোখেই দেখেনি কুশল। যাদের দেখেছে, ছোটবেলার চেহারাটা মনে আছে, এখন দেখলে হয়তো চিনতে পারবে না। কুশলকে আগের চেহারার সঙ্গে মেলাতে ওদেরও বেগ পেতে হবে।

ছোটবেলায় বীরপাড়ায় গেলে সারাদিন মামাতো ভাই-বোনের সঙ্গে হুটোপাটি করে কেটে যেত। ওখানকার আলো-বাতাস কলকাতার থেকে একদম আলাদা। অধিকাংশ সময় কেমন একটা বৃষ্টি আসবে-আসবে গন্ধ। কখনও আবার কী ঝলমলে রোদ, তেমন তার তেজ! বেশিক্ষণ খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা যেত না। শীতে পড়ত জাঁকিয়ে ঠান্ডা। মেঘ-রোদ-ঠান্ডার দিনে মাঝে-মাঝেই দেখা দিত ভুটান পাহাড়। বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়েই দেখতে পাওয়া যেত। কখনও-কখনও বেশ কিছুদিনের জন্য একেবারে উধাও। স্কুলের কোনও লম্বা ছুটিতে মামাবাড়িতে গিয়ে দেখাই হল না হয়তো পাহাড়টা।

কুশল মা-কে জিজ্ঞেস করত, "কোথায় গেল পাহাড়টা? দেখতে পাচ্ছি না কেন?"

মা বলত, "বেড়াতে গিয়েছে।" ছোট্ট উত্তর দিয়ে মা ব্যস্ত হয়ে যেত অন্য কাজে। মায়ের সেখানে অনেক কাজ, প্রচুর গল্প-আড্ডা। কুশলের জন্য সময় কই! ছোট্ট কুশল ভাবত, পাহাড় সত্যিই বুঝি বেড়াতে যায়। রাস্তার পাশে হঠাৎ কোনও গাছকে না দেখলে মনে হত বেড়াতে গিয়েছে। আসলে হয়তো কাটা হয়েছে গাছটা। মাঝে-মধ্যে বন-জঙ্গল উধাও হয়ে যেত। কুশলের ধারণা হয়েছিল, পৃথিবীর সমস্ত কিছুই বুঝি বেড়াতে যায়। যেমন তারা কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছে। মা মারা যাওয়ার পর অনেকদিন পর্যন্ত কুশলের বিশ্বাস ছিল, মা ঠিক ফিরে আসবে। বেড়াতে গিয়েছে মা।

মায়ের বেড়াতে যাওয়া বলতে বীরপাড়ার কথাই মনে পড়ত আগে। ওখানে গেলে মায়ের হাবভাব পালটে যেত, ছেলের দিকে সেভাবে লক্ষ নেই। দৌড়তে গিয়ে পড়ে গেলে, ছড়ে কেটে গেল কিনা দেখতে মোটেই আসত না। দিদা, মামিরাই দেখভাল করত কুশলের। মামাবাড়ি গেলে মা একটু পর হয়ে যেত। অনিশ্চয়তায় ভুগত কুশল, মা কি তাকে ভুলে যাচ্ছে? ভাবনাটা চেপে বসলেই মায়ের পাশে ঘুরঘুর করত। খিদে না পেলেও খেতে চাইত। খানিক বিরক্তির সঙ্গে মা বলত, "দিদার কাছে গিয়ে চা। আমার এখন দম ফেলার ফুরসত নেই।"

পাত্তা না পেলেও মায়ের উপর রাগ হত না। চনমনে হাসিখুশি মাকে দেখতে তার ভালই লাগত। এই হয়তো দৌড়ে গেল বাগানে, ক'টা বেগুন তুলে নিয়ে এল। খালিপায়ে চলে গেল দুটো বাড়ি পরে বুলবুলিমাসিদের বাড়ি। মামাবাড়িতে মাকে গলা তুলে ঝগড়া করতে দেখেছে কুশল, খিলখিল করে হাসি, পুকুরে সাঁতার...। কুঁদঘাটের বাড়িতে মা একদম অন্যরকম। মুখে কথা কম। সবসময় স্বামী, পুত্রের সুবিধে-অসুবিধের দিকে নজর। ঘরদোর ফিটফাট। কুঁদঘাটের বাড়িতে ঘরে হাওয়াই চটি পরার রেওয়াজ। কলকাতায় মায়ের বিনোদন বলতে পাশের বাড়ির কাকিমার সঙ্গে দুপুরবেলা সিনেমায় যাওয়া। বাবার সঙ্গে মা কোনওদিন সিনেমা-থিয়েটারে গিয়েছে কিনা, মনে করতে পারে না কুশল। বাবা-মায়ের সঙ্গে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার স্মৃতিও কুশলের নেই। বাড়িতে একটা ছবি আছে, বাবা আর মায়ের হাত ধরে দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে কুশল। পিছনে গাছপালা। বাবা বলে, ওটা চিড়িয়াখানায় গিয়ে তোলা ছবি। মায়ের সঙ্গে চিড়িয়াখানা যাওয়ার কথা মনে নেই কুশলের। মা মারা যাওয়ার পর বাবা বহুবার নিয়ে এসেছে। জীবন্ত মাকে মনে করতে গেলে বীরপাড়ার প্রেক্ষাপটেই বেশি করে মনে পড়ে অথবা মনে করতে ভাল লাগে। সেই ছবিও ধীরে-ধীরে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এবার মামাবাড়ি গিয়ে মায়ের ছবিটা কি একটু স্পষ্ট হবে? নাকি বীরপাড়া এতটাই বদলে গিয়েছে যে, মায়ের কোনও আভাসই পাওয়া যাবে না। বড়মামার যদি এটাই শেষ রোগ হয়, ওই বাড়িতে যাওয়ার আর কোনও উপলক্ষ থাকবে না। বড়মামাই মায়ের শেষ স্মৃতিটুকু নিয়ে চলে যাবে। পল্টুর কাছে মামার শরীর খারাপ শুনে একটা টান তৈরি হয়েছিল বীরপাড়া যাওয়ার। তখনই পল্টুকে কোনও কথা দেয়নি কুশল। বলেছিল, অফিসে চাপ আছে, চেষ্টা করবে যাওয়ার।

চাপ একেবারেই নেই। গত দু'মাসে কোম্পানিতে নতুন কোনও প্রজেক্টের অর্ডার আসেনি। চাইলেই ছুটি পাওয়া যাবে। বাবার সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য সময়টা নিয়েছিল কুশল। খবর শুনে বাবা যেতেই বলল। কারণ বড়মামা বিনোদ যে কুশলকে অত্যন্ত স্নেহ করে, সেকথা কারও অজানা নয়।

পরের দিনই ট্রেনের টিকিট কেটে কুশল মামাবাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দিল, সে যাচ্ছে। বড়মামি ধরেছিল ফোন, খুবই উচ্ছ্বসিত হল কুশল আসছে জেনে। তবু একবার বলল, ট্রেনে ওঠার পর একটা ফোন করিস।

ফোন করা হল না। মামিরা ধরেই নিয়েছে, অন্যান্যবারের মতো এবারও কুশল আসছে না। অভিমানবশত নিজেরাও ফোন করেনি। কাল কুশলকে

দেখে চমকে যাবে।

চোখের ওপর আলো ঘুরে গেল মনে হচ্ছে। চকিতে বাস্তবে ফেরে কুশল। চোখের পাতা খুলে দেখে, পর্দার উপর টর্চের গোল আলো ঘোরাফেরা করছে। ধক করে ওঠে বুক, হামলাবাজরা কি এসে গেল? সম্ভবত না। আলো সরে গেল, বুটের শব্দ চলে যাচ্ছে দূরে। উঠে বসে কুশল পর্দা ফাঁক করে দেখে, আরপিএফ টহল দিচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ আগে থেমেছিল ট্রেন। বোধহয় বর্ধমান। তখনই উঠেছে রেলপুলিশের দল।

বার্থ থেকে নেমে দাঁড়ায় কুশল। আপার বার্থ থেকে গাঢ় নিশ্বাসের শব্দ আসছে। বাঃ, কুশলকে কশাস থাকতে বলে, নিজে সাঁটিয়ে ঘুম মারছে! মেয়েটার বিপদ সত্যিই কতটা গুরুতর, সেই নিয়ে এখন সন্দেহ জাগছে কুশলের। একবার টয়লেট যেতে হবে কুশলের। সিটের নীচে নিজের ব্যাগটা একবার দেখে নিয়ে টয়লেটের দিকে এগিয়ে যায় কুশল।

ফিরে এসে মোবাইলে শিবকুমার শর্মার ভুপালি চালিয়ে ইয়ারফোন গোঁজে কানে। চোখ বুজতেই ভেসে ওঠে বীরপাড়ার ডিমডিমা নদী, মাঝে-মাঝেই বেড়াতে যাওয়া হত। এক গ্রীষ্মে নদীও গিয়েছিল বেড়াতে। জল প্রায় ছিলই না। নদীখাতে শুধুই নুড়িপাথর। দু'পাশের গাছগাছালি নদীর জন্য মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রবল ধাক্কায় ঘুম ভাঙে কুশলের, হামলা কি শুরু হয়ে গেল তাহলে? ধড়মড় করে উঠে বসে দেখে, নীলা দাঁড়িয়ে সামনে। চোখেমুখে কীসের যেন অনুযোগ। দুষ্কৃতীরা কি ওর কোনও ক্ষতি করে গেল? ইয়ারফোন খোলে কুশল।

খানিক অনুতাপের সঙ্গে কুশল বলে, "এনিথিং রং?"

"কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে," বলল নীলা।

খবরটা অবাক করার মতো কিছু নয়। ছোটবেলায় বীরপাড়া আসার সময় বহুবার ট্রেন থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছে কুশল। বড় হয়ে এই রুটে বেড়াতে বা অফিসটুরে আসার পথেও লক্ষ করেছে। তাই নিরুত্তাপ গলায় জানতে চায়, "এনজেপি পার হয়েছে গাড়ি?"

"না যায়নি। আলুয়াবাড়ি ছাড়িয়ে এসেছি। এবার এনজেপি ঢুকবে," বলার পর নীলা গলায় পরিমাণমতো ন্যাকামি মিশিয়ে বলে, "কী হল, দেখবে না কাঞ্চনজঙ্ঘা?"

কুশল জানলায় ঝুঁকে দেখার চেষ্টা করে, গাঢ় কাচের কারণে বাইরের দৃশ্যপট আবছা অন্ধকারে ঢাকা। আলোও তো বেশিক্ষণ হল ফোটেনি।

নীলা বলে, "এখান থেকে দেখা যাবে না। দরজার কাছে চলো। সবাই যাচ্ছে।"

এতটুকু উৎসাহ পায় না কুশল, মিছিমিছি মাটি হল ঘুমটা। র‍্যাপারের তলায় পা গুটিয়ে বাবু হয়ে বসল সে। বড়সড় একটা হাই উঠতে যাচ্ছিল, মুখের সামনে হাত এনে ছোট করে সেটা। নীলা বসে পড়েছে কুশলের বার্থে। কপট অভিমানে বলতে থাকে, "তুমি এত আনরোম্যান্টিক কেন বলো তো! মোনালিসা দেখছে না, তার একটা কারণ আছে। ও ঠিক করেছে দার্জিলিং গিয়েই দেখবে।"

লাগেজ গোছাতে থাকা মুন্নি কুশলদের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে ছোট্ট করে হাসল। ওর ভালনাম তার মানে মোনালিসা। দার্জিলিং যাবে যখন, নামবে এনজেপি-তে।

ফের নীলা খোঁচায়, "চলো না গিয়ে দেখি। এই জন্য তোমাকে আমার ভাল লাগে না।"

কুশলেরও ভাল লাগছে না একটা গোটা রাত পার করে এসেও অভিনয়টা চালিয়ে যেতে। অন্ধকার থাকতে উঠে মুন্নিদের সঙ্গে আরও বেশি করে আলাপ জমিয়েছে নীলা। কুশলকে বর না প্রেমিক, কী বলে যে পরিচয় দিয়েছে, ও-ই জানে! আধুনিকা বিবাহিতার কাছে আজকাল লোকে শাঁখা, সিঁদুর আশাও করে না। এখানে বসে থাকাটা নিরাপদ নয়, কুশলের ঘুম এখনও কাটেনি, অভিনয় ঠিকঠাক হবে না। বালিশের পাশ থেকে চশমাটা নিয়ে পরে নেয় কুশল। বার্থ থেকে নেমে দাঁড়ায়। নীলা একগাল হাসি সমেত এগিয়ে যায় ট্রেনের দরজা লক্ষ করে। খোলা দরজা আগলে কয়েকজন কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখছে।

সেখানে পৌঁছে কুশল নীলাকে বলে, "এই রুটে যাওয়ার সময় বহুবার আমি কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছি। ঘুমটা না ভাঙালেই পারতেন।"

ঘুরে কুশলের মুখোমুখি হল নীলা। বলল, "এই কারণে আপনাকে ডাকিনি। মোনালিসা নেমে যাচ্ছে, আপনাকে 'বাই' করার জন্য উসখুস করছিল। তাছাড়া আপনি এনজেপি নামবেন কি না বুঝতে পারছি না। বহু প্যাসেঞ্জার তো এখানেই নেমে যায়।

শেষ যুক্তিটা তবু মানা যায়, প্রথমটা স্রেফ বদমাইশি। কুশলকে দেখার পর থেকে মুন্নি কখনওই কোনও আগ্রহ প্রকাশ করেনি। নীলা এসে যে-অ্যাক্টিংটা শুরু করল, তারপর তো আর প্রয়াস চালানোর কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

"অবশ্য চিন্তা করার কিছু নেই, মোনালিসার ফোন নম্বর, অ্যাড্রেস সব নিয়ে রেখেছি। দিয়ে দেব আপনাকে," বলল নীলা।

লেগপুলিং আটকাতে প্রসঙ্গ ঘোরায় কুশল। জানতে চায়, "আপনি কি এখন আউট অফ ডেঞ্জার? চলে গিয়েছে তারা?"

"না যায়নি। তবে দিনেরবেলা ঝামেলা করবে বলে মনে হয় না। এনজেপি-তে নেমেও যেতে পারে।"

"তারা এখন কোথায়? একবার কি দেখা যায়?"

"দেখে কী করবেন?"

"না, কিছু করার নেই। সারারাত কাদের হাত থেকে আপনাকে প্রোটেক্ট করলাম, দেখতে একটু কৌতূহল হচ্ছে।"

গলায় ব্যাঙ্গের সুর এনে নীলা বলে, "কী আমার প্রোটেক্ট করনেওয়ালারে! এমন ঘুমোচ্ছে, আমাকেই ঠেলে তুলতে হল!"

"ঘুম তো শুরু করলেন আপনি। শোওয়ার দশ মিনিটের মধ্যেই। আমার সন্দেহ হচ্ছে আপনি আদৌ কোনও বিপদে পড়েছেন কি না।"

"তাহলে কেন আপনার সঙ্গে এরকম করলাম? কী মনে হচ্ছে আপনার?"

জেরা টাইপ প্রশ্নের মুখে চিরকালই থতমত খায় কুশল, এখনও খেল। নীলাকে সন্দেহ করার মতো সলিড কোনও প্রমাণও তার হাতে নেই। ভাগ্যিস ট্রেনটা এইসময় এনজেপি-র প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে শুরু করল। কুশলরা ফিরতে বাধ্য হয়। করিডোরে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এখানে নামার প্যাসেঞ্জার। পাশ কাটিয়ে নিজেদের জায়গায় পৌঁছয় কুশলরা।

মুন্নির পরিবার হাসিমুখে বিদায় জানাল কুশল, নীলাকে। মুন্নি হাত তুলে টাটা করল নীলাকে। কুশলের দিকে আলাদা করে তাকাল, দৃষ্টিতে লাস্য। বেশ হকচকিয়ে যায় কুশল, নীলার কথা এক্ষেত্রে মিলে গেল। কুশলের প্রতি আলাদা মনোযোগ দিল মুন্নি। নীলা কি ফাঁকতালে মুন্নিকে তার আর কুশলের রিলেশনের প্রকৃত রূপটা বলে দিয়েছে?

"কী, বলছিলাম না, মোনালিসার আপনার প্রতি আলাদা ইন্টারেস্ট তৈরি হয়েছে," যেন কুশলের মনের কথা পড়ে নিয়ে বলে উঠল নীলা।

কুশল শুধু বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, "কিন্তু..."

এবারও বাকিটা ধরতে অসুবিধে হল না নীলার। তবে কুশলের মতের সঙ্গে তার মত মিলল না।

নীলা বলল, "মেয়েদের তো এটাই মজা। যাকে একবার ভাল লাগে, সিগনাল দেবেই। সঙ্গে কে আছে না আছে কেয়ারই করবে না। তবে হ্যাঁ, রিলেশনটা সিরিয়াসলি নেওয়ার আগে অনেক দিক দেখে নেয়। এটা আবার ছেলেদের মধ্যে নেই।"

নীলার কথা থেকে যা বোঝা গেল, অতিরিক্ত উপকারটা সে করেনি। বলেনি, কুশল আর নীলার আসল সম্পর্ক। মেয়েটার মনে হয় জ্ঞান দেওয়াটা হবি। আর কতক্ষণ জ্বালাবে কে জানে!

ট্রেন ফের চলতে শুরু করেছে। কুশলদের কামরার বেশির ভাগ লোক নেমে গিয়েছে। কাউকে উঠতেও দেখা গেল না।

নীলা বলে ওঠে, "যাক, নিশ্চিন্ত। নেমে গেল লোকদুটো। আপনি এখন ফ্রি।"

কোথাও না গিয়ে, ঘাড় এপাশ-ওপাশ না ঘুরিয়েও সিটে বসে থেকে নীলা কী করে যে টের পেল দুষ্কৃতীরা নেমে গিয়েছে, ধরতে পারে না কুশল। বলছে যখন, তখন নিশ্চয়ই আর নেই। কুশলও চাপমুক্ত হয়। লোকদুটোকে দেখতে না পাওয়ার জন্য একটু আপসোস রয়েই গেল।

কুশল নীলার কাছে জানতে চায়, "লোকদুটো আপনাকে টার্গেট করেছিল কেন?"

"আছে কারণ। বলা যাবে না। একটু পার্সোনাল," বলল নীলা।

দমে যায় কুশল। বেশ রাগও হয় মেয়েটার উপর। প্রয়োজনে অভিনয় করাবে, পাহারা দেওয়াবে অথচ ঘটনার কিছুই বলবে না! কুশল কি ওর অ্যাপয়েন্ট করা গার্ড? কৌতূহল মেটাতেই হবে নীলাকে।

প্রশ্নটা এবার একটু ঘুরিয়ে করে কুশল। বলে, "আচ্ছা, আপনি যে দুম করে এসে আমার সঙ্গে একটা মিথ্যে সম্পর্কের গল্প বানালেন, আমি তো আপনাকে কোম্পানি না-ও দিতে পারতাম। অ্যাডভান্টেজ নেওয়ারও সুযোগ ছিল। ঝুঁকিটা নিলেন কী ভেবে?"

"রিস্ক আমায় নিতেই হত। এই বার্থে যে-ই বসে থাকুক, কোনও একটা রিলেশন পাতাতে হত আমাকে। তেমন লোক হলে অবশ্য অ্যাক্টিংটা টেনে নিয়ে যেতে পারতাম না। আপনাকে দেখে সেরকম আমার মনে হয়নি। তাই অনেকর ফ্রি থাকতে পেরেছি। ইট্স মাই লাক!"

"আমাকে দেখে কীরকম মনে হল? বোকাসোকা, ক্যাবলা মার্কা?"

"নট এগজ্যাক্টলি। নরমসরম মানুষ বলেই মনে হয়েছিল। বোঝাই যাচ্ছিল

amarboi.com

সাপোর্ট পাব।"

যতই মাখন লাগাক নীলা, তাকে যে হাবাগোবা ঠাওরেছে এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই কুশলের। একলাফে স্মার্ট হওয়ার চেষ্টায় সে জানতে চায়, "নীলা নামটা আপনার আসল তো?"

"গুড কোয়েশ্চেন!" প্রশংসার সুরে বলল নীলা। মুখে মজা পাওয়ার হাসি। তারপর বলে, "আমার আসল নাম বসুধা। বসুধা রায়।"

ভাল মতো হোঁচট খেয়েও সামলে নেয় কুশল। বলে, "এটাই যে সত্যি নাম, সেটা কী করে বুঝব?"

"আইডি কার্ড দেখালেই প্রমাণ হয়ে যাবে। তবে আমি দেখাব না। দেখে আপনার কী লাভ হবে! ধরে নিন ওই দুটো নামের মধ্যে যে-কোনও একটা আসল।

"প্রথমে নিজেকে 'নীলা' নামে পরিচয় দেওয়ার কারণ?" ভুরুজোড়া কাছাকাছি এনে প্রশ্ন করে কুশল।

নীলা অথবা বসুধা জবাব দিল, "নীলা নামটা আমার ভীষণ পছন্দ। নিজেই দিয়েছি। ভাবতে ভাল লাগে, নীলা আজ এই করল, সেই করল। আজ অমুকের সঙ্গে ঝগড়া করাটা উচিত হয়নি নীলার। বেচারি বাসে কাঁদছিল, নীলা জানতেও পারল না। ট্রেনে যেতে-যেতে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখল। নীলা মাকে ফোন করে জানাবে ভেবেও জানাল না..."

ট্রেনের তালে চলে যাচ্ছে কথা। হেঁয়ালির মতো শোনালেও, কুশলের মনে হচ্ছে উত্তর আছে হাতের কাছেই। মেয়েটা যে চমক দিতে চাইছে, তাও বলা যাবে না। গভীর বিশ্বাস আর আন্তরিকতার সঙ্গে বলে যাচ্ছে কথাগুলো।

কুশল নিজের মাথাকে ব্যস্ত না করে সরাসরি জানতে চায়, "কথাগুলো তাহলে ভাবছেটা কে? তার নাম কী?"

"কেন, বসুধা! ওই নামটাই আমার সার্টিফিকেটে আছে। বাড়ির লোক, বন্ধুবান্ধব সবাই ওই নামেই ডাকে। আমার কোনও ডাকনাম নেই।"

কুশল বেশ ধন্দে পড়ে যায়, এরপর মেয়েটাকে নিয়ে ভাবতে গেলে কোন নামটা নির্দিষ্ট করবে?

"চা, কফি," হেঁকে সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছিল হকার। মেয়েটি দাঁড় করায়। কুশলকে জিজ্ঞেস করে, "চা, না কফি?"

"চা।"

"আমিও তাই।"

নাম একটা স্থির করা ছিল বলে মেয়েটা পরিচিতর গণ্ডির মধ্যে এসে গিয়েছিল, এখন ফের দূরের মানুষ হয়ে গিয়েছে। কেমন যেন একলা-একলা লাগছে কুশলের।

গরম দুধজলে টি-ব্যাগ ফেলে দুটো কাপ দু'জনকে এগিয়ে দেয় চা-ওলা, দাম মেটায় মেয়েটা।

চায়ে চুমুক দিয়ে মেয়েটি বলে, "জানি আপনার মাথায় এখন কী চলছে।"

কুশল চা খেতে-খেতে সপ্রশ্নদৃষ্টিতে তাকায়।

মেয়েটি বলতে থাকে, "আমার সম্বন্ধে আপনার এখন দুটো ধারণা হয়েছে। বুঝতে পারছেন না কোনটা ঠিক। এক নম্বর হচ্ছে, আমি কোনও মেন্টাল অ্যাসাইলাম থেকে পালিয়ে আসা রোগী। দুই, আমি আন্ডারওয়ার্ল্ডের কোনও র‍্যাকেটে কাজ করি। বেআইনি কোনও কিছু পাচার করছি। তাই পিছনে লোক লেগেছিল।"

দুটো সম্ভবনার কোনওটাই মাথায় আসেনি কুশলের। আসার মতো জোরালো কোনও লক্ষণও দেখা যায়নি। তবে মেয়েটার মধ্যে যে বড়সড় একটা গোলমাল আছে, এটা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। গন্ডগোলটা ঠিক কী, জানার ইচ্ছে হয় না কুশলের। আর ঘণ্টাখানেক পর তো দু'জনের রাস্তা আলাদা হয়ে যাবে।

চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে কুশলের। কাগজের কাপ সিটের নীচে রেখে দেয়। ফোন বেজে ওঠে মেয়েটার। জনপ্রিয় বাংলা গানের রিংটোন। ফোন কানে নিয়ে উঠে যায় নীলা অথবা বসুধা। বাবাকে ফোন করার কথা মনে পড়ে কুশলের। অনেকক্ষণ সকাল হয়েছে, আবার বাবা আগে করে বসবে।

বাড়ির নম্বরে কল করে কুশল। দু'বার রিং হতেই ফোন তুলল বাবা, "এখন কোথায়?"

"আর কিছুক্ষণের মধ্যে শিলিগুড়ি ঢুকব।"

"রাতে ভাল ঘুম হয়েছে?"

"হয়েছে।"

"মালবাজার এলেই লাগেজ গুছিয়ে নিয়ো।"

"আচ্ছা," বলে লাইন কাটে কুশল। ফোনসেট পাঞ্জাবির পকেটে ঢোকাতে গিয়ে দেখে মেয়েটা সিটে বসে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

দিদিমনির ঢঙে জিজ্ঞেস করে, "সিঙ্গল চাইল্ড?"

আন্দাজ করা এমন কিছু কঠিন নয়, এক বয়স্ক ছেলের বাড়ি থেকে এত যখন ফোন আসছে। উত্তরে ছোট করে ঘাড় হেলায় কুশল।

মেয়েটা বলে ওঠে, "সো সুইট!"

ফের ভুরু কুঁচকে কুশল অবাকগলায় বলে, "মানে? সুইট কীসের?"

মেয়েটি বলে, "আপনার মাথা নাড়াটা। একমাত্র সন্তান হওয়াটা যেন আপনারই অপরাধ।"

উপযুক্ত একটা জবাব হাতড়াতে থাকে কুশল। মেয়েটা হাসছে। খুব খুশি হয়েছে কুশলকে বোকা বানাতে পেরে। লাগসই কথা খুঁজেও পায় কুশল, কিন্তু অসময়ে বেজে ওঠে ফোন। এখন আবার কে করল?

ফের বাবা! ফোন কানে দিয়ে কুশল বলে, "বলো।"

ওপ্রান্ত থেকে বাবা বলে, "মনে করে ওবাড়ির জন্য মিষ্টি নিয়ো কিন্তু।"

"অসুখের বাড়িতে মিষ্টি নিয়ে যাব?" দ্বিধাজড়িত স্বরে বলে কুশল।

বাবা বলে, "সবাই তো আর রোগে পড়ে নেই। এতদিন পরে যাচ্ছ। ফল-মিষ্টি নিয়ে যাবে। আর যেমন বলেছিলাম, বিনোদকে একটু সুস্থ মনে হলে, একদিন বাজারে গিয়ে বাড়ির..."

বাকি কথা চাপা পড়ে গেল মেয়েটির উচ্ছ্বাসে। জানলার ওপর ঝুঁকে সে চেঁচিয়ে উঠেছে, "ওয়াহ্, অ্যামেজিং! আবার দেখা যাচ্ছে। একদম ক্লিয়ার..."

"ঠিক আছে। রাখছি," বলে ফোনটা কেটে দেয় কুশল। গলা নিশ্চয়ই শুনতে পেল বাবা। আওয়াজ শুনে বুঝতে অসুবিধে হয়নি লেডি কো-প্যাসেঞ্জার খুব কাছেই আছে। কী ভাবল, কে জানে।

কপালে বিরক্তির ভাঁজ নিয়ে বসে থাকে কুশল। কানে আসে মেয়েটির গলা, "সরি।"

ঘাড় ফেরায় কুশল, মেয়েটির মুখে কাঁচুমাচু ভাব। বলে, "কাঞ্চনজঙ্ঘা আবার দেখতে পেয়ে এক্সাইটমেন্ট ধরে রাখতে পারিনি। চেঁচিয়ে ফেললাম। ডিসটার্ব করলাম আপনাকে।"

"ইট্‌স অল রাইট," বলে ফোন পকেটে ঢোকায় কুশল।

"আপনার কেউ অসুস্থ? তাঁকে দেখতে যাচ্ছেন?"

ঘাড় নেড়ে সায় জানায় কুশল। মুখে বলে, "আমার বড়মামা।"

একটু চুপ থেকে মেয়েটি বলে, "আই অ্যাম রিয়েলি ফিলিং গিল্টি। আপনার রিলেটিভ অসুস্থ। টেনশনে আছেন আপনি। সেই থেকে ইয়ার্কি মেরে যাচ্ছি।"

এই প্রথম মেয়েটির মুখে বিষাদ লক্ষ করল কুশল। পরিস্থিতি হাল্কা করতে কুশল বলে, "সেরকম টেনশনের কিছু নয়। মামার বয়স হয়েছে, শরীর ভাল যাচ্ছে না। তাই দেখতে যাচ্ছি।"

ট্রেনের গতি কমে এল। শিলিগুড়ি জংশনে ঢুকছে। মেয়েটির অস্বস্তি খানিকটা কেটেছে। বলে, "আপনার রিংটোনটা অদ্ভুত! মেমরি কার্ডে লোড করা আছে গানটা?"

"আছে।"

"শোনাবেন প্লিজ?"

কুশল ফোনসেটে ইয়ারফোনের কর্ডটা জোড়ে। গানটা সার্চ করে প্লে অপশন দেয়। মোবাইলটা মেয়েটির হাতে দিয়ে, সিটের নীচে রাখা ব্যাগের চেন খুলে পেস্ট-ব্রাশ বের করে। কাঁধে টাওয়েল নিয়ে টয়লেটের দিকে পা বাড়ায়।

ফ্রেশ হয়ে ফিরে এসে কুশল দ্যাখে, মেয়েটি তখনও কানে ফোন গুঁজে গান শুনছে। টয়লেটে ঢুকে কুশল নিজেকে একবার প্রশ্ন করেছিল, মেয়েটিকে হঠাৎ কেন আমি বিশ্বাস করতে শুরু করলাম? ফোন, পার্স, লাগেজ সবই তো রয়ে গেল ওর হেফাজতে। সত্যি মিথ্যে হোক পরিচয় হিসেবে একটা নাম তবু সম্বল ছিল, এখন তাও নেই। মেয়েটি কী-কী কারণে বিশ্বাস অর্জন করে ফেলল, নাকি সে নিজেই চাইছে ওকে বিশ্বাস করতে, অবোধ্য রয়ে গেল কুশলের কাছে।

কুশলকে দেখে ইয়ারফোন খোলে মেয়েটি। নীচের ঠোঁট উল্টে ভ্রু ভঙ্গিসহ বলে, "দারুণ গান।"

"কোনটা শুনছিলেন?" বার্থে বসে জানতে চায় কুশল।

"আপনি যে-গানটা দিয়ে গিয়েছিলেন।"

"ওটা তো মিনিট দশেকের গান। আমার ফিরতে কুড়ি মিনিটের ওপর লাগল।"

"ওটাই শুনছিলাম ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। কোথা থেকে পেলেন এত পুরনো গান? গায়িকা দু'জনের নাম কী?"

"আমার এক বন্ধুর কাছে ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিকের প্রচুর স্টক আছে, ওর থেকে নিয়েছি। ঠুংরি। একসঙ্গে গেয়েছেন নির্মলাদেবী আর লক্ষ্মীশঙ্কর।"

"এঁদের নাম আমি কখনও শুনিনি।"

"ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল শোনার ঝোঁক থাকলে শুনতেন।"

সেবক স্টেশন পার করে গেল ট্রেন। এখানে স্টপেজ নেই। জানলার বাইরে বন-জঙ্গলের রাজ্য শুরু হয়েছে। এবার অনেক নদী, চা-বাগান দেখা দেবে এই পথে। ছোটবেলায় এই পথে যাওয়ার দারুণ একটা স্মৃতি রয়ে গিয়েছে কুশলের মনে।

"গানটা এত ভাল লাগল কেন বলুন তো? এখনও বেজে যাচ্ছে কানে। সুরের জন্যে কি?" জানতে চাইল মেয়েটি।

কুশল বলে, "হতে পারে।"

কাচের জানলা ভেদ করে চলন্ত ট্রেনের করিডোর ছুঁয়েছে রোদ। গোটা কামরায় পাঁচ-ছ'জনের বেশি প্যাসেঞ্জার বোধহয় নেই। দূর থেকে ভেসে আসছে দু'-একটা কথা। শিলিগুড়িতেও অনেক লোক নেমে গিয়েছে।

ফের নীলা বলে, "গানটা আপনার কেন ভাল লাগে?"

"কী জানি," বলে প্রশ্ন এড়ায় কুশল। গানটা ভাল লাগার পিছনে নিজের অনিভূতিগুলো বলতেই পারত। সেসব একেবারেই ব্যক্তিগত অনুভব। কী দরকার মেয়েটির সঙ্গে শেয়ার করে। আর হয়তো কোনওদিন দেখাও হবে না।

ঠুংরিটা যে মেয়েটিকে বেশ অন্যমনস্ক করে দিয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কেমন যেন চুপ মেরে গিয়েছে। লাগেজ থেকে টয়লেটকিট, ড্রেস নিয়ে প্যাসেজ ধরে সে এগিয়ে গেল।

কুশল বার্থ থেকে নেমে দাঁড়ায়। ড্রেস চেঞ্জ করে নিতে হবে। মালবাজার আসতে বেশি দেরি নেই। তার একঘণ্টা পরেই দলগাঁও। মানে বীরপাড়া। এদিকে খিদেও পেয়েছে বেশ। গতকাল সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ ডিনার সেরে ট্রেন ধরেছিল। বারো ঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছে, পেটে চা ছাড়া কিছু পড়েনি। বড়লোকের কামরা বলে ছোলা, মুড়ির হকার আসছে না। এই ট্রেনে প্যান্ট্রি কারও নেই। স্টেশন থেকে রেল ক্যান্টিনের লোক যদি ব্রেকফাস্ট প্যাক নিয়ে আসে, তবেই বাঁচোয়া। বাড়ি থেকে বেরনোর আগে বাবা একবার জিজ্ঞেস করেছিল সঙ্গে বিস্কিট, স্ন্যাক্সের প্যাকেট কিছু নিয়েছে কি না।

কুশল ভেবেছিল প্ল্যাটফর্মে এসে কিনে নেবে। ভুলে গিয়েছে কিনতে। এখানেই স্পষ্ট হয় মায়ের অভাব। বাবা যতই খেয়াল রাখুক ছেলের উপর, এই ফাঁকটা ভরাট হবে না। মা থাকলে অবশ্যই আগে থেকে স্ন্যাক্সের প্যাকেট ঢুকিয়ে দিত ব্যাগে। মায়েদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এটা। বাবারা কখনওই মায়ের সম্পূর্ণ রোল প্লে করতে পারে না। তবে এসবে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে কুশল। মা মারা যাওয়ার পর কতবার চুল আঁচড়াতে ভুলে গিয়ে স্কুলে গিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। তাড়াহুড়ো করে ড্রেস করেছে, গাড়ি করে অফিস যাওয়ার পথে বাবা কুশলকে ড্রপ করেছে স্কুলে, খেয়ালই করেনি ছেলের চুল আঁচড়ানো নেই। হাসাহাসি করেছে বন্ধুরা। বকেছেন টিচার। মনের চোখে কুশল যখন নিজের স্কুলবেলাটা দেখে, একদঙ্গল ছাত্রের মধ্যে একলা হয়ে যাওয়া কিশোরটিকেও দেখতে পায়। সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্য সত্ত্বেও রুখোসুখো তার চেহারা। যেন মালি স্কুলের সব চারাগাছের গোড়ায় জল দিলেও, ভুলে গিয়েছে তার বেলায়।

"ব্রেকফাস্ট। ব্রেকফাস্ট। ভেজ, ননভেজ।"

ডাক শুনে ঘাড় ফেরায় কুশল, রেল ক্যান্টিনের লোক ট্রে হাতে করে হেঁটে আসছে। প্রায় শূন্য কামরায় ডাকটাকে মনে হচ্ছে কল্পনার জগত থেকে আসা। ড্রেস চেঞ্জ করে নিয়েছে কুশল, সার্ভিস বয় কাছে আসতে প্রথমে একটা ননভেজ চায়। পরমুহূর্তে আরও একটা ভেজ দিতে বলে। মেয়েটিও খালিপেটে আছে, ওর সামনে বসে খেতে অস্বস্তি হবে কুশলের।

ফয়েলপ্যাকে মোড়া দুটো বাক্স রেখে টাকা নিয়ে চলে যাচ্ছে বয়, কুশল জিজ্ঞেস করে, "হ্যাঁ গো, চা আসবে তো? অনেকক্ষণ ধরে তো কারওরই দেখা নেই।"

"আসবে, আমার পিছনেই আসছে," বলে এগিয়ে গেল রেলসার্ভিসের লোক।

ননভেজ ফয়েলটা তুলতে গিয়েও তোলে না কুশল, কে জানে মেয়েটি কোনটা খাবে। স্নান-সুগন্ধ ভেসে আসে কাছে।

ফিরে এসেছে মেয়েটি, ফয়েলের দিকে তাকিয়ে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে, "ইউ আর সো কম্প্যাশনেট। খানিক আগেই ভাবছিলাম, নীলার ভীষণ খিদে পেয়েছে। ব্যাগে শুধুই বিস্কিটের প্যাকেট। জলও চেয়ে খেতে হবে সঙ্গের ছেলেটার থেকে। তাছাড়া খিদের মুখে শুকনো বিস্কিট..."

কথার গাড়ি থামাতে কুশল বলে ওঠে, "ভেজ না ননভেজ? দু'রকমই নিয়েছি। কোনটা খাবেন?"

হাসিমুখে বার্থে এসে বসল মেয়েটি। হাতের জামাকাপড়, পেস্ট-ব্রাশ রুকস্যাকে ঢোকাতে-ঢোকাতে বলল, "দুটো মিলিয়ে মিশিয়ে খাই চলুন।"

ফয়েল দুটো খুলতে থাকে কুশল। মেয়েটির গন্তব্য বোধহয় এসে গেল। কাছাকাছি নামবে। নাইটড্রেস চেঞ্জ করে নিয়েছে। পরনে গত সন্ধের পোশাক। ব্যাগে জিনিসপত্র ঢুকিয়ে বার্থে পা গুটিয়ে বসল মেয়েটি।

বলল, "নীলা কত ইনোসেন্ট, ফ্রেন্ডলি দেখুন, অচেনা কো-প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে বিনা দ্বিধায় খাবার ভাগাভাগি করে খেতে বসে গেল। কিছু মেশানো থাকতে পারে খাবারে। ট্রেনে হামেশাই এরকম হচ্ছে। যাত্রীকে বেহুঁশ করে সর্বস্ব লুঠ।"

যথেষ্ট অপমান বোধ করে কুশল। কথাটা হজম করতে সময় লাগে। ভাল করতে গিয়ে ভুলভাল কমেন্ট শুনতে হল। একটু ভেবেই অবশ্য উপযুক্ত জবাব খুঁজে পেয়ে যায়।

"আমি যদি বলি, নীলাকে বাইরে থেকে যতটা সহজসরল বলে মনে হয়, তেমনটা সে নয়। নীলা বুদ্ধি করেই খাবার ভাগ করে খেতে চেয়েছে। যাতে দুর্বৃত্তকেও মাদক মেশানো খাবার খেতে হয়।"

মুখে ব্রেডস্লাইস পুরে নিয়েছে মেয়েটি, খাবার চিবোতে-চিবোতেই বলে, "আপনি তো খুবই ইন্টেলিজেন্ট! নীলা কিন্তু এত ভেবে কিছু বলেনি। তার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। সে বুদ্ধিমতীর ভান করে মাত্র।"

খেতে শুরু করেছে কুশল। খেতে-খেতেই বলে, "নীলা তো একটা ফ্যান্টাসির জগতে থাকে বলেই মনে হচ্ছে। রাতের দুই হামলাবাজ কি ওই ফ্যান্টাসির পার্ট? লোকদুটো হঠাৎ ধাওয়া করা ছেড়ে সকালবেলা নেমে যাওয়াটা কেমন জানি অ্যাবসার্ড লাগছে।"

মেয়েটির মুখটা একটু সিরিয়াস হল। বলল, "পুরোটা কল্পনা নয়, অনেকটাই সত্যি। আপনার সাহায্য না পেলে যথেষ্ট সমস্যায় পড়তাম। জেনারেলি আপনার মতো বুদ্ধিমানরা এতটা উদারমনস্ক হন না। তাঁদের মাথায় হাজারটা প্রশ্ন ঘোরে সব সময়।"

খাবারের দিকে চোখ রেখে নিরাসক্ত অভিব্যক্তিতে কুশল বলে, "আমি কিন্তু ব্রেকফাস্টে কমপ্লিমেন্ট আদায়ের কোনও মাদক মেশাইনি।"

হেসে ফেলে মেয়েটি। শিশুর মতো অমলিন হাসি। বলে, "আপনি ইচ্ছে করে একটু ক্যাবলা সেজে থাকেন, তাই না? মেয়েদের ইমপ্রেস করার এটাও একটা রাস্তা। বেশির ভাগ ছেলেই বোকার মতো মেয়েদের সামনে নিজেকে স্মার্ট দেখাতে চায়। বোকামিটা সহজেই ধরতে পারে মেয়েরা।"

খাওয়া থেমে গিয়েছে কুশলের। অবাক হয়ে জানতে চায়, "হঠাৎ ইমপ্রেস করার কথা উঠছে কেন?"

মেয়েটি বলতে থাকে, "কাল যখন বানিয়ে-বানিয়ে আপনার মায়ের সঙ্গে আমার ফোনের কনভারসেশনটা বলছিলাম, এক জায়গায় বললাম, আমি মাসিমাকে বলেছি, কুশল বুঝি আমার নাম আপনার কাছে করেনি। ও কিন্তু বলেছিল করেছে। একদিন আলাপ করাতে নিয়ে যাবে বাড়িতে, একথাও বলে রেখেছে। বলার পর আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি, কী, ঠিক বলেছি না? আপনি সম্ভবত আমার কথাগুলো শুনছিলেন না। উত্তর দেওয়ার ভদ্রতা করতে গিয়ে বলে উঠলেন, হ্যাঁ, ঠিকই তো। আমি তখন হাসি চাপতে ব্যস্ত, দেখি মোনালিসাও হাসছে।"

এখন আক্ষেপ হচ্ছে কুশলের, কথাগুলো মন দিয়ে শোনা উচিত ছিল। বোকা বনেছে খুব। দোষ হচ্ছে এই মেয়েটির, এসে থেকে এমন বকবক শুরু করে দিয়েছিল!

ভেজ কাটলেটের শেষ টুকরোটা মুখে পুরে খাওয়া শেষ করল মেয়েটা। রুকস্যাকের পকেট থেকে কাগজের ন্যাপকিন বের করে একটা এগিয়ে দিল কুশলের দিকে, অন্য একটা দিয়ে নিজের মুখ-হাত মুছতে থাকল।

তারপর বলল, "আপনার ওই অন্যমনস্কতা দেখেই মোনালিসা আঁচ করেছে আমাদের মধ্যে বন্ডিংটা সলিড নয়। অনেক ফাঁকফোঁকড় আছে। সেই কারণেই শেষ পর্যন্ত আপনার প্রতি ইন্টারেস্ট দেখিয়ে গিয়েছে মেয়েটা।"

একথার কোনও প্রতিক্রিয়া হয় না কুশলের মনে। সামনে বসে থাকা মেয়েটি যে কী পরিমাণ ভাবনা-বিলাসী তার আর একটা প্রমাণ পায়। কুশলেরও খাওয়া শেষ। চা-ওলা এখনও এল না। ন্যাপকিনে মুখ মুছে ফয়েলপ্যাকে রাখে কুশল। মেয়েটা সবক'টা প্যাকেট তুলে নিয়ে সিটের নীচে চালান করে।

তারপর নিজের মোবাইলটা বের করে বলে, "মোনালিসার নম্বরটা নিয়ে নিন। পরে ভুলে যাব। আপনিও লজ্জায় চাইতে পারবেন না।"

মেয়েটার খ্যাপামিতে হেসে ফেলে কুশল। এমন সময় চা-ওলার ডাক শোনা যায়। করিডোরের ওপ্রান্ত থেকে হেঁটে আসছে। হাতের ইশারায় তাকে ডাকে কুশল। মেয়েটা বলে, "হাসলেন যে বড়!"

উত্তরের বদলে ফের অল্প হাসে কুশল। মেয়েটি যেন নিজের ভুল বুঝতে পারে। বলে ওঠে, "ওহ, আমার তো একটা জিনিস জানাই হয়নি আপনার থেকে। আপনি কি ম্যারেড বা কোনও স্টেডি রিলেশনশিপ আছে?"

চা বিক্রেতা এসে দাঁড়িয়েছে। ছোট একটা ব্রিজ পার হল ট্রেনটা। মাটির ভাঁড়ে দু'জনকে চা দিল লোকটা। দাম মেটাল মেয়েটি। ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে ফের কুশলকে বলে, "উত্তর পেলাম না কিন্তু।"

anandalok.com

চা খেতে-খেতে কুশল বলে, "আপনার কী মনে হয়?"

"আমার আন্দাজ কোনও স্টেডি পার্টনার নেই আপনার। থাকলে এতক্ষণে একটা দুটো ফোন আসত। যে-ক'টা কল এল, সবই গার্ডিয়ানের। আই থিঙ্ক, ইউ আর দ্য মোস্ট এলিজিব্‌ল লাভার।"

কুশল বলল, "আপনারও একটাই মাত্র কল এসেছিল, সেটা অবশ্য কার, বুঝতে পারিনি।"

"আমি ডিভোর্সি।"

কথাটা যেন চেন টেনে ধরল। দাঁড়িয়ে গেল ট্রেন। আসলে থমকে গিয়েছে কুশলের মন। ট্রেন নিজের মতোই চলছে অরণ্যভূমি চিরে। পাশের বাড়ির আলপনাদির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে কুশলের, ধুমধাম করে প্রেমিকের সঙ্গে বিয়ে হল। বাড়ির লোক তাপসদাকে প্রথম দিকে মেনে নেয়নি, আলপনাদির জেদের কাছে হার মানতে হয়। বিয়ের এক বছরের মাথায় তাপসদা হঠাৎ বাইক অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল। আলপনাদি ফিরে এল বাপের বাড়িতে। দিন পনেরো কুড়ি ভয়ঙ্কর রকমের গুম মেরে রইল। কান্নাকাটি, শোকবিলাপ কিচ্ছু নেই। যেন একটা পাথরখণ্ড গায়ে মেঘের ছায়া নিয়ে সামান্য পরিধির মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধীরে-ধীরে বদল শুরু হল আলপনাদির। সাজগোজ বাড়ল, চুল কেটে ফেলল কাঁধ পর্যন্ত, কপালে বেমানান বড় টিপ। পরণে অদ্ভুত ধরনের জাঙ্ক জুয়েলারি, ঝকমকে শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ, পয়েন্টেড হিলের জুতো। মানে, আগের সেই শান্ত স্নিগ্ধ আলপনাদি আমূল বদলে গেল। প্রচুর কথা বলত লোকজনের সঙ্গে, প্রগল্‌ভতার মধ্যে কেমন যেন একটা হ্যাংলামি। কুশল তখন জয়েন্ট এন্ট্রান্সের প্রস্তুতি নিচ্ছে, আলপনাদির বদল তার পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটাত। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ত বারেবারে, আশঙ্কা হত, এই বুঝি আলপনাদির কোনও ক্ষতি হয়ে গেল। যে-হারে সস্তা করে ফেলছে নিজেকে। কৈশোর উত্তীর্ণ সময়কালে কুশলের কাছে আলপনাদিই ছিল 'নারী'র সংজ্ঞা। অদ্ভুত শ্রদ্ধামিশ্রিত যৌন আকর্ষণবোধ করত কুশল। মুগ্ধতাটা নিশ্চয়ই টের পেত আলপনাদি, বয়সে বড়, অভিজ্ঞতা অনেক। কুশলকে কিন্তু কখনও প্রশয় দেয়নি। দিদির মতোই শাসনের বেড়া তুলে রাখত। আচার ব্যবহার পরিবর্তিত হতেই সেই বেড়া সরিয়ে আলপনাদি একবার হানা দিয়েছিল কুশলের নিজস্ব জগতে। অদৃশ্য তাপ থেকে আগুন হয়ে জ্বলে উঠতে চেয়েছিল। কুশলের দ্বিধা, অপ্রতিভতায় আলপনাদির উদ্যম ব্যর্থ হয়। এই ঘটনায় আলপনাদির প্রতি এতটুকু শ্রদ্ধা কমেনি কুশলের। বুঝতে পেরেছিল আলপনাদির এই বদলে যাওয়াটা আসলে শোক থেকে বেরিয়ে আসার মরিয়া প্রচেষ্টা। ভাগ্যিস চিরঞ্জয়দা একইভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিল আলপনাদিকে। চিরঞ্জয়দা লোকাল কমিটির সেক্রেটারি। পার্টির হোল-টাইমার। পারিবারিক ব্যবসাতেও সাহায্য করে। চিরঞ্জয়দা নিজে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিল আলপনাদির বাড়ি। মেয়ের ভাগ্য বিপর্যয়ে জেঠিমা, জেঠুর বেসামাল অবস্থা, চিরঞ্জয়দা তাঁদের কাছে চাঁদ হয়ে ধরা দিয়েছিল। কুশলদের পাড়ায় ওই বিয়েটা অনেকদিন মনে রাখবে এলাকার লোক। বিয়ের পর আবার আগের অবস্থায় ফিরে গেল আলপনাদি, ছোট টিপ, মার্জিত সাজ। কুশলের সহযাত্রীর এই যে প্রগল্‌ভতা, তার নেপথ্যে হয়তো কাজ করছে সম্পর্ক বিচ্ছেদের বিষাদ। যার থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে মেয়েটা। ওর স্বামী নিশ্চয়ই মারা যায়নি। তবু সম্পর্ক মরে যাওয়াটাও তো একটা বিরাট আঘাত।

"তখন থেকে মুখ শুকনো করে কী ভাবছেন বলুন তো? ডিভোর্স যেন বিশাল কোনও একটা দুঃখের ব্যাপার।"

মেয়েটার কথার সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে সামলে নেয় কুশল, সত্যিই একটু বেশিই ভাবা হয়ে যাচ্ছিল। বলে ওঠে, "না, ডিভোর্স তো হতেই পারে। জোর করে মানিয়ে চলা তার চেয়ে বেশি খারাপ।"

"রাইট ইউ আর। ডিভোর্সের পর থেকে আমি জীবনটা অন্যরকমভাবে উপভোগ করছি। নিজের অস্তিত্বটাকে আলাদা করে ডিফাইন করা যাচ্ছে। আমি এখন পুরোপুরি মা-বাবার শাসনের আন্ডারে নেই, শ্বশুরবাড়ির কর্তৃত্বের বাইরে। তাই তো একা সাহস করে বন্ধুর কাছে বেড়াতে যাচ্ছি।"

তথ্য জানার সুযোগ হাতছাড়া করে না কুশল। জিজ্ঞেস করে, "বন্ধুর বাড়ি কোথায়?"

"আলিপুরদুয়ার। ঠিক বাড়ি বলা চলে না, চাকরিসূত্রে এখানে থাকে। কলেজে পড়ায়।"

এতক্ষণে জানা গেল মেয়েটা কোথায় নামবে। ট্রেনটার ওটাই লাস্ট স্টপ। কুশল বলে, "আমি দলগাঁও নেমে যাব। একঘণ্টা দশ-পনেরো মিনিট পর আপনার স্টপ। মাঝে হাসিমারায় গাড়ি দাঁড়াবে।"

"আপনি এই রুটে অনেকবার এসেছেন, তাই না?"

"ছোটবেলায় প্রায়ই আসতাম। এখন আর তেমন আসা হয় না।"

জানলার দিকে ঘুরে মেয়েটা বলে, "ফেরার সময় এসিতে আসব না। বাইরের দৃশ্য ভালমতো দেখাই যাচ্ছে না কাচের জানলার জন্য। অবশ্য তাতেও যা দেখেছি, মন ভরে গিয়েছে আমার। ট্রেনে বসে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা তো রীতিমতো থ্রিলিং!"

একটু থেমে মেয়েটা বলে, "হয়তো একা আছি বলেই সব কিছু এত ভাল লাগছে। যেন বাড়তি পাওনা।"

চুপ করে গিয়েও কী একটা ভেবে নিয়ে মেয়েটা আবার বলে, "আমি তো ভাবছি ডিভোর্সের সুফল নিয়ে একটা বই লিখে ফেলব। অবশ্যই সেটা মহিলাদের উদ্দেশে। বইয়ে সারকথা থাকবে, প্রথমবার জেনে-বুঝে ভুল বিয়ে করুন, ডিভোর্সের পর ফিরে পান সম্পূর্ণ আমিকে। বইটার নাম দেব..."

ট্রেনের গতি কম ছিলই, এখন একেবারে দাঁড়িয়ে গেল। জানলা দিয়ে কুশল দেখে, মালবাজার স্টেশনে থেমেছে ট্রেন। এনজেপি-র পর থেকে এসি টু-টায়ারে কেউ উঠছে না, কামরা খালি করে ক্রমশ নেমে যাচ্ছে। এখানেও নেমে গেল দু'জন। বইয়ের নাম এখনও খুঁজে পায়নি মেয়েটা, ভেবে যাচ্ছে।

কুশল বলে, "এই ট্রিপে আপনার সব কিছু পাওনা হয়নি, ক্ষতিও হয়েছে।"

"কীরকম?"

কুশল বলল, "সোনার দুল হারাল যে।"

মেয়েটি মিটিমিটি হাসছে। নিখাদ দুষ্টুমির হাসি। কুশলের বুঝতে অসুবিধে হয় না, দুল হারানোর মধ্যেও কোনও মিথ্যে মিশে আছে। আন্দাজ মিলে গেল। বার্থের কোনায় পড়ে থাকা হ্যান্ডব্যাগটা তুলে নিয়ে চেন খুলে মুক্তোর জোড়া দুল বের করল মেয়েটি। বদমাইশির হাসিটা এখন সারামুখে ছড়িয়ে পড়েছে।

খানিক বিরক্তিসহ কুশল বলে, "এর মানে কী?"

"ভেরি সিম্পল। দুল না হারালে আমি তো আপনাকে ডেকে বলতে পারছিলাম না, বিপদে পড়ে অ্যাস্কিং করছি।"

কুশল কোনও উত্তর দেয় না। বিপদ নিয়ে তার ঘোর সন্দেহ আছে, সম্ভবত ওটাও বানানো। তবে বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে যে মেয়েটি এসব করছে না, কুশল এতক্ষণে সেটা বুঝে গিয়েছে। আলপনাদির উগ্র সাজের মতোই এই মেয়েটা রচনা করছে উচ্চকিত কল্পনার জগৎ। অবাঞ্ছিত একাকিত্ব ভরাট করার জন্যই দু'জনের এই ভিন্ন-ভিন্ন প্রয়াস।

বার্থ থেকে নেমে দাঁড়াল কুশল। মেয়েটিকে বলে, "আসুন, আপনাকে একটা দারুণ দৃশ্য দেখাই। এটাও আপনার উপরি পাওনা হবে।"

উৎসাহিত হয় মেয়েটি। কুশল এগিয়ে যায় ট্রেনের দরজার দিকে। মেয়েটি তাকে অনুসরণ করে।

লক করা ছিল দরজা। কুশল খুলে দিতেই গাছপালার গন্ধসমেত দমকা হাওয়া ঢুকে এল। প্রায় রেললাইনের গা থেকেই শুরু হয়েছে দিগন্তবিস্তৃত চা-বাগান। কচি পাতায় মোলায়েম রোদ পড়ে তৈরি হয়েছে অনন্য সুন্দর প্রাকৃতিক গালিচা। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মন আপনিই ভারহীন হয়ে যায়।

"সত্যিই অপূর্ব!" কুশলের পাশে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে মেয়েটি।

কুশল বলল, "এখনও কিছুই দেখেননি। মনকে প্রস্তুত রাখুন। কী দেখতে চলেছেন, আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। মামাবাড়িতে যতবার আসা-যাওয়া করেছি, মালবাজার দলগাঁওর মাঝের পথটুকু হাঁ করে তাকিয়ে থেকেছি বাইরে।"

ট্রেনের গতি এখানে বেশ কম। রেললাইনে হাতি কাটা পড়ার জন্যই এই সতর্কতা। চা-বাগান শেষ হয়ে জঙ্গল শুরু হল। বড়-বড় শাল, সেগুন, পাইন আরও সব নাম-না-জানা গাছ। মেয়েটি উৎসুক হয়ে চেয়ে আছে জঙ্গলের দিকে। ট্রেনের আওয়াজের ফলে এক গাছ থেকে অন্য গাছে উড়ে যাচ্ছে পাখি। অদ্ভুত এক মগ্ন নৈঃশব্দ্যের পাশ ঘেঁসে চলেছে কুশলরা। এসে গেল সেই জায়গা।

কুশল বলে উঠল, "দেখুন দেখুন!"

জঙ্গল শেষ হয়ে দেখা যাচ্ছে নদীখাত। তিরতিরে জলও আছে নদীতে। নুড়িপাথর ছাড়াও বেশ কিছু বড়-বড় পাথরখণ্ড আছে। ঘন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে নদীটা। দূরে কুয়াশামাখা ভুটান পাহাড়। নদী চলেছে রেললাইনের পাশে-পাশে।

"অ্যামেজিং। মনে হচ্ছে কোনও মানুষের পা পড়েনি এখানে। একটুকরো স্বর্গ," বলে উঠল মেয়েটি।

কুশল বলে, "ছোটবেলায় মায়ের সঙ্গে যখন মামাবাড়ি আসতাম, ট্রেন এখানে পৌঁছলেই মা আমাকে দরজার কাছে নিয়ে যেত। তখন ক্লাস টু কিংবা থ্রি, মামাবাড়ি থেকে ফিরছি, শেষ হতে চলেছে বিকেল, দরজার কাছে মায়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছি, দেখি, একটা হরিণশিশু জঙ্গল থেকে বেরিয়ে থমকে গিয়ে ট্রেনের দিকে দেখছে। এসেছিল হয়তো নদীতে জল খেতে। বাস্তবে

হরিণটার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়েছিল কি না মনে নেই। অথচ আমি ইচ্ছে করলেই হরিণটার চেয়ে থাকা দেখতে পাই। তুলনাহীন সারল্য ওই দৃষ্টিতে। ওই দৃশ্য আজও আমি ভুলতে পারি না।"

নদীখাত অদৃশ্য হল জঙ্গলে। সম্বিৎ ফিরল কুশলের। একটু বেশি আবেগ দেখিয়ে ফেলল কি? এত কথা বলা ঠিক হল না, মেয়েটি এখনও জঙ্গলের দিকে নিবিড়ভাবে তাকিয়ে আছে।

কুশল বলে, "চলুন যাই, আমার স্টেশন চলে এল প্রায়। লাগেজ নিয়ে আসি গেটে।"

বার্থের দিকে এগিয়ে যায় কুশল। মেয়েটি আরও কিছুক্ষণ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে ফেরত আসে।

স্লিপার লাগেজে ঢুকিয়ে নিয়ে জুতো পরে নিয়েছে কুশল। বার্থে ফিরে আসার পর থেকে মেয়েটি এখনও একটাও কথা বলেনি। এতক্ষণ ধরে চুপচাপ বসে থাকাটা ওর আচরণের সঙ্গে মিলছে না। কুশলেরই কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছে। ট্রলিব্যাগটা ফ্লোরে দাঁড় করিয়েছে কুশল, ট্রেনের গতি কমলেই বার্থ ছেড়ে উঠে দাঁড়াবে। আসন্ন নিঃসঙ্গতা বুঝি এখনই ছায়া ফেলেছে মেয়েটির উপর।

খারাপ লাগে কুশলের। খানিক সৌজন্যবশত তাকে বলে, "আমার ফোন নম্বর কি দিয়ে রাখব আপনাকে? এখনও তো বেশ কিছুটা পথ একা যাবেন, আলিপুরদুয়ার জায়গাটাও আপনার কাছে নতুন। যদি দরকার পড়ে ফোন করতে পারেন আমাকে।"

মুহূর্তে মুড পালটে যায় মেয়েটির। আগ্রহের সঙ্গে বলে, "হ্যাঁ, দিন না প্লিজ। আমি চাইলে খারাপ দেখায় বলে বলতে পারছিলাম না।"

ট্রেনের গতি কমে আসছে। জানলার বাইরে দেখা যাচ্ছে জনপদ। অন্য কথায় না গিয়ে কুশল নিজের ফোন নম্বরটা বলতে থাকে। মেয়েটি নিজের মোবাইলে সেভ করে নেয়।

দলগাঁও প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে ট্রেন। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল মেয়েটি, ফোন বেজে ওঠে কুশলের। বাবার কল হওয়ার সম্ভবনা বেশি। বার্থ থেকে নেমে ফোনসেট বের করে দেখে, ঠিক তাই। সুইচ টিপে ফোন কানে নেয় কুশল, ট্রলিব্যাগের হ্যান্ডেল ধরে এগোতে থাকে গেটের দিকে।

বাবাকে বলে, "পৌঁছে গিয়েছি। নামছি ট্রেন থেকে।"

ওপ্রান্ত থেকে বাবা বলে, "মোটামুটি ঠিক সময়েই আছে। আমি ভাবলাম বুঝি লেট হবে, কাল যখন অত দেরি করে ছাড়ল।"

"রাতের দিকে ম্যানেজ করে নিয়েছে।"

"তোমাকে নিশ্চয়ই ওবাড়ির কেউ রিসিভ করতে আসবে। দুম করে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে যেয়ো না। একটু অপেক্ষা কোরো। অনেকদিন পর যাচ্ছ, চেহারায় বদল এসেছে তোমার, চিনতে অসুবিধে হতে পারে ওদের।"

"ঠিক আছে, ওয়েট করব," বলে ফোন কাটতে যাচ্ছিল কুশল। বাবা বলে উঠল, "মনে করে ফল-মিষ্টি নিয়ো।"

"আচ্ছা।"

ফোন রাখার পর কুশলের খেয়াল হয়, প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়েছে সে। ছেড়ে আসা কামরার দিকে তাকায়, খোঁজে জানলাটা, যার পাশে বসে আছে মেয়েটি। নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয় না, সব জানলার কাচ এখন কালো।

মুখ ঘুরিয়ে নেয় কুশল। একটা খিঁচ থেকে গেল মনে। সৌজন্যমূলক বিদায় সম্ভাষণ পাওনা ছিল মেয়েটির। ছেলেকে নিয়ে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা কবে যে কাটবে বাবার! এমন সময় ফোনটা এল।

ট্রলিব্যাগের হ্যান্ডেল ধরে এগোয় কুশল। তার জন্য প্ল্যাটফর্মে কেউ অপেক্ষা করবে না, জানে। কাল যদি ট্রেনে ওঠার পর মামির কথামতো একটা ফোন করে দিত, অবশ্যই আসত কেউ একজন। স্টেশনটা বেশ ঝকঝকে হয়েছে। ওভারব্রিজটাও আগে দেখেনি কুশল। ট্রেনটা বাঁশি বাজিয়ে ছেড়ে যাচ্ছে প্ল্যাটফর্ম, কুশল আর-একবার ঘুরে তাকায়, যদি গেটে এসে দাঁড়ায় মেয়েটা।

এসি টু-টায়ার কোচের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল কুশল, গেটে তাকে দেখা গেল না। আবার মাঠ-জঙ্গলের আওতায় চলে গেল ট্রেন।

স্টেশনের বাইরে সিমেন্ট ঢালা চত্বরে এসে দাঁড়িয়েছে কুশল। আগে এত সাজানো-বাঁধানো ছিল না স্টেশন। বেড়াহীন দুটো প্ল্যাটফর্ম আর লাল রঙের ছোট্ট টিকিটঘর। চারপাশে তাকিয়ে পুরনো বীরপাড়ার সঙ্গে কোনও মিলই খুঁজে পাচ্ছে না। অনেক পাকাবাড়ি, দোকানপাট দেখা যাচ্ছে। গাছপালা প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। সামনেই পরিষ্কার পিচঢালা রাস্তা।

চারটে রিকশা দাঁড়িয়ে ছিল স্টেশন চত্বরে, একজন অলসভাবে রিকশা নিয়ে এসে দাঁড়ায় সামনে। এই আলস্যটাই একমাত্র চেনা লাগে কুশলের। বীরপাড়ায় ঘড়ির কাঁটা খুব ধীরে-ধীরে চলে, ছোটবেলাতেই খেয়াল করেছে কুশল।

"কোথায় যাবেন বাবু?"

"সুভাষপল্লি। সান্যালবাড়ি।"

বলার পর অপেক্ষা করতে হল না কুশলকে, রিকশাওলা কুশলের হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে তুলল পাদানিতে। বলল, "উঠে পড়ুন।"

অর্থাৎ বীরপাড়া পালটে গেলেও, সান্যালবাড়ির পপুলারিটি কমেনি। রিকশায় উঠে বসতেই কুশলের মোবাইলে একটা মেসেজ এল। জরুরি মেসেজ বড় একটা আসে না কুশলের। বেশির ভাগই কোম্পানিগুলোর নানা অফার। কাজের মধ্যে থাকাকালীন মেসেজগুলো তখনই দেখে না কুশল, এখন দেখল। মেয়েটি বেজায় ফাজিল, এখনও মাথায় দুষ্টুমি কিলবিল করছে। প্রথমে মোনালিসা বসু লিখে একটা মোবাইল নম্বর দিয়েছে। তারপর লিখেছে, 'এটা নেওয়ার জন্য নিজের নম্বর দেওয়ার কোনও দরকার ছিল না।'

রাগ করার বদলে হাসি চলে এল কুশলের মুখে। মনে-মনে বলল, না, এ ধরনের মজা, দুষ্টুমি ওর মধ্যে যত থাকে ততই ভাল। দুঃখ-কষ্ট সহজে গ্রাস করতে পারবে না।

রিকশা যত এগোচ্ছে, পুরনো বীরপাড়াকে ফিরে পাচ্ছে কুশল। অনেক কিছু বদলে গেলেও, আগের একটা জলছাপ রয়ে গিয়েছে। এখন যে-রাস্তা ধরে যাচ্ছে, কুশল জানে আর একটু এগোলেই বাঁ-হাতি গলি পড়বে, ওটাই মামাবাড়ি যাওয়ার রাস্তা। সুভাষপল্লিতে অনেক আগেই চলে এসেছে।

রিকশা ঢুকল গলিতে। আগে এটা মাটির রাস্তা ছিল, এখন ইট পাতা। দু'পাশে সারি দিয়ে বাড়ি। আগে ডান-হাতি জায়গাটায় খোলা মাঠ ছিল। ওই তো মামাবাড়ির গেট দেখা যাচ্ছে, কে যেন পিছন ফিরে সাইকেল মুছছে, মাথায় গামছা। গেটটা কাঠেরই আছে। বাড়ির বাউন্ডারিতে এখন পাকা পাঁচিল। বাঁশের বেড়া ছিল আগে।

ফের মেসেজের রিংটোন বেজে উঠল। মেয়েটা কি কোনও রিপ্লাই চাইছে? নম্বরটা দেওয়াই ওকে ভুল হল, এখন মাঝে-মধ্যেই ইয়ার্কি মেরে যাবে।

ফোনসেট বের করে মেসেজবক্স খোলে কুশল। লেখা আছে, 'বাইরে দারুণ ল্যান্ডস্কেপ। তবু নীলার মনখারাপ। মিস করছে কুশলকে।'

"বাবু, সান্যালবাড়ি," বলল রিকশাচালক।

চটক ভাঙে কুশলের। রিকশা দাঁড়িয়েছে মামাবাড়ির গেটের সামনে। গামছা মাথায় উবু হয়ে যে-লোকটা সাইকেল পরিষ্কার করছিল, ঘুরে সে উঠে দাঁড়ায়। কুশল তো অবাক! যার অসুস্থতার খবরে এতদূর ছুটে এল, সেই বড়মামা দিব্যি শক্তসামর্থ্য অবস্থায় সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ভাগ্নেকে দেখার এ ধরনের মেঠো কৌশলের কথা বাবা যদি জানতে পারে, ভয়ঙ্কর রেগে যাবে। মামাও সেটা জানে। তাহলে?

কুশলের দৃষ্টিতে প্রশ্নের ভিড়। উত্তরে বড়মামা গম্ভীরভাবে বলে, "ভিতরে আয়। সব বলছি।"

ফোনটা অনেকক্ষণ হাতে নিয়ে বসে রইল বসুধা, মেসেজের রিপ্লাই এল না। ফোন হ্যান্ডব্যাগে ঢুকিয়ে ম্যাগাজিন তুলে নিল চোখের সামনে। ছেলেটার উত্তরের জন্য সে যে খুব আকুল হয়ে বসে ছিল, তা নয়। জার্নির মজার রেশটা ধরে রাখতে চাইছিল। আর একটু পরেই কুয়াশার মতো মনখারাপ ঘিরে ধরবে বসুধাকে।

অবস্থাটা চলছে বেশ কিছুদিন ধরে। এর থেকে রেহাই পেতেই রত্নার কাছে যাচ্ছে বসুধা। ব্যক্তিগতভাবে বসুধার সমস্যার বিশেষ কোনও সমাধান করতে পারবে না রত্না। করার কথাও নয়, বিষয়টা ওর হাতের বাইরে। বসুধা যাচ্ছে রত্না আলিপুরদুয়ারে থাকে বলে। স্থানটাই এখানে প্রধান। রত্নার সঙ্গ অবশ্য যথেষ্ট উপভোগ্য। ওর সঙ্গে গভীর না হলেও, একটা ভাল বন্ধুত্ব আছে বসুধার। গভীর বন্ধুত্বটা ঠিক কীরকম হয় বসুধার জানা নেই। টিনএজ রিলেশনে এরকম একটা ফিলিং আসে বটে, একটু বড় হতেই মানুষ বুঝতে পারে, সে কতটা একা। সৌভাগ্যবশত তাকে কিছু ভাল মানুষ ঘিরে থাকতে পারে। বসুধার কাছে রত্না সেরকমই একজন। মনে-মনে রত্নাকে শ্রদ্ধা করে বসুধা। ভীষণ সাহসি মেয়ে রত্না। দু'জনের আলাপ হয়েছিল প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হওয়ার পর। রত্নার মধ্যে কোনও ধরনের দেখানেপনা নেই। প্রয়োজন মতো হাসি-মজাতেও যোগ দিত। কলেজের শুরুতে অল্প ক'দিনেই রত্নাকে ভাল লেগে গিয়েছিল বসুধার। সেটা সম্ভবত বিপরীত স্বভাবের কারণে। সম্পর্কটা একটু নিবিড় হতেই রত্না বসুধাকে জানিয়েছিল, সে জীবনে বিয়ে করবে না। অধ্যাপনা করবে, একা থাকবে। বসুধা বলত, আমি বাবা ওসব ঝক্কিতে নেই। চাকরি যদি করতেই হয়, কলকাতাতেই করব। যাতায়াত করব

anarbon.com

বাড়ি থেকে। শাঁসালো পাত্র পেলে ঝুলে পড়ব ঘাড়ে। দেশ, বিদেশ যেখানে নিয়ে যেতে চায় যাব, একা কিছুতেই থাকব না।

ডোমজুড় থেকে উজিয়ে কলেজে আসত রত্না। এতটুকু ক্লান্ত দেখাত না ওকে। বসুধা পাইকপাড়া থেকে কলেজ স্ট্রিট আসতেই হাঁপিয়ে যেত। রত্না বেশ কয়েকবার পাইকপাড়ার বাড়িতে গিয়েছে। একবার সন্ধে উতরে গেলে বসুধার বাবা বলেছিল ট্যাক্সি করে পৌঁছে দেবে বাড়ি। রাজি হয়নি রত্না। রাত আটটার সময় বসুধাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাস পালটে-পালটে ডোমজুড়ে পৌঁছেছিল। বহুবার বলা সত্ত্বেও রত্নাদের বাড়িতে যাওয়া হয়নি বসুধার। আজ সত্যিকারের প্রয়োজন যখন পড়েছে, ছুটতে হচ্ছে আলিপুরদুয়ারে।

নেট কোয়ালিফাই করার পর রত্নার কাছে প্রথমেই আলিপুরদুয়ার কলেজ থেকে অফার আসে। বিনা দ্বিধায় কল অ্যাকসেপ্ট করে রত্না। বসুধা নেট পরীক্ষায় বসেনি। মাস্টার্সের পর বাবার বন্ধুর পাবলিশিং হাউসে ঢুকে গিয়েছে। সাব-এডিটিং-এর কাজ। মূলত টেকস্ট বইয়ের পাবলিশার। বছরের কয়েকটা মাস একটু চাপ থাকে। বাকি সময় ফ্রি। বন্ধুর মেয়ে বলে মালিক রঞ্জনকাকু বসুধাকে ভালই প্রশ্রয় দেয়। প্রায় খেলাচ্ছলে চাকরিটা করে বসুধা। গুরুগম্ভীর চাকরি করার ইচ্ছে কোনওদিনই ছিল না, একপাল স্টুডেন্টের সামনে গলার শিরা ফুলিয়ে শিক্ষকতা তো নয়ই। তাই কোনও ধরনের কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দেয়নি সে। রত্নাকে দূরের কলেজের চাকরিটা নিতে দেখে বেশ অবাক হয়েছিল। কেন জানি বসুধার মনে হয়েছিল, রত্নার পরিবারে নিশ্চয়ই কোনও অশান্তির পরিবেশ আছে। সেই জন্যই মেয়েটা দূরে চলে যেতে চায়। ওদের সংসার যথেষ্ট সচ্ছল। অভাব মেটানোর তাগিদে প্রথম যে-চাকরি পাবে, সেটাই নিতে হবে, তেমন পরিস্থিতি নয়। রত্নার বাবা প্রফেসর ছিলেন। দুই দাদা সরকারি চাকরি করে। তাহলে ও কেন আর ক'টা দিন অপেক্ষা করল না কলকাতার কাছাকাছি কোনও কলেজ থেকে অফারের জন্য?

কৌতূহল মেটাতে বসুধা একদিন ঘুরিয়ে রত্নাকে জিজ্ঞেস করে, "হ্যাঁ রে, তোর কী এমন ঠেকা পড়েছে যে, অত দূরে গিয়ে একা থেকে চাকরি করবি?"

রত্না বলেছিল, "আমরা সবাই আসলে একা। চেনা পরিমণ্ডলে থাকি বলে তেমন টের পাই না। ওখানে গিয়ে থাকতে শুরু করলে আবার একটা চেনাজানার গণ্ডি তৈরি হয়ে যাবে।"

উত্তরটা মোটেই যুক্তিযুক্ত মনে হয়নি বসুধার। ছোট থেকে যে-পরিচয়সূত্রে গেঁথে যায় মানুষ, তার সঙ্গে ভিন্ন পরিবেশের নতুন বন্ধুমণ্ডলের কোনও তুলনাই চলে না। বসুধার একথাও একবার মনে হয়, হয়তো ভালবাসার কোনও মানুষের থেকে দূরে চলে যেতে চাইছে রত্না। অবশ্যই মানুষটি রত্নার প্রেমিক। কোনও অলঙ্ঘণীয় কারণে ওদের প্রেম পরিণতি পাবে না। মানুষটির বিবাহিত হওয়ার সম্ভবনাই প্রবল। অথবা নিকট আত্মীয়। এইসব সাত-পাঁচ ভেবে বসুধা সিদ্ধান্ত নেয়, রত্না যেদিন কলেজে জয়েন করার জন্য আলিপুরদুয়ারের ট্রেন ধরবে, সি-অফ করতে যাবে সে। আগে থেকে রত্নাকে কিছু জানাবে না। বসুধা শিওর ছিল, সেইদিন নিশ্চয়ই রত্নার প্রেমিক বিদায় জানাতে আসবে। রত্নাকে হাতেনাতে ধরবে বসুধা। জানতে চাইবে, কেন এই মানুষটির কথা রত্না তাকে বলেনি? বসুধা তো নিজের জীবনের সমস্ত কথাই বন্ধুকে বলেছে। গোটাচারেক খুচরো প্রেমের ঘটনাও আছে তার মধ্যে।

নির্দিষ্ট দিনে ট্রেন ছাড়ার আগে শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছেছিল বসুধা। যাওয়ার তারিখ, ট্রেনের সময় জেনে রেখেছিল গল্প করার ছলে। প্ল্যাটফর্মে বসুধাকে দেখে রত্না অবাক। বলেছিল, "কীরে তুই! কোনও রিলেটিভ যাচ্ছে নাকি এই ট্রেনে? সি-অফ করতে এসেছিস?"

বসুধা বলেছিল, "না, তোর জন্য এসেছি।"

কথা শুনে বসুধাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল রত্না। বলেছিল, "তুই ভীষণ মিষ্টি মেয়ে রে। আমার কপাল খুব ভাল, তোর মতো একটা বন্ধু পেয়েছিলাম কলেজে।"

বসুধার আসল উদ্দেশ্যটা রত্না জানল না। ওর ভুল ভাঙায়নি বসুধা। অবাক হয়ে দেখেছিল, বাড়ির কোনও লোকও আসেনি রত্নাকে বিদায় জানাতে। বসুধা জিজ্ঞেসও করে, "হ্যাঁ রে, বাড়ির কাউকে দেখছি না!"

রত্না বলেছিল, "আসতে চেয়েছিল। আমিই বারণ করেছি। ট্রেনে তুলে দেওয়ার মতো কচি খুকি তো আমি নই। সঙ্গে ফোন আছে, আর কী চাই!"

ট্রেন ছাড়ার খানিক আগে হন্তদন্ত হয়ে এসেছিল রত্নার বড়দা। বলল, "সব ঠিকঠাক আছে তো? রিজার্ভেশন লিস্টে নাম দেখে নিয়েছিস? ট্রেন রাইট টাইমে ছাড়বে। এনকোয়্যারিতে জেনে এলাম।"

খানিক ধমকের সুরে রত্না বলেছিল, "তুমি আবার কাজ ফেলে আসতে গেলে কেন? খামোকা দৌড়ঝাঁপ করার কোনও মানে হয়! তোমাদের বারণ করেছিলাম না আসতে?"

পরক্ষণেই উৎসাহ নিভে গিয়েছিল রত্নার দাদার। অপরাধীগলায় বলেছিল, "অফিসের কাজে এদিকে আসতে হয়েছিল। ঘড়িতে দেখলাম এখনও ট্রেন ছাড়ার সময় হয়নি। ভাবলুম একটু ঘুরেই যাই।"

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল কথাগুলো অজুহাত। উদ্বেগ এবং স্নেহের টানেই চলে এসেছে দাদা। বাকি সময়টুকু বোনের সামনে চুপচাপ রইল। রত্না উঠে গিয়েছিল ট্রেনে। কারওর অপেক্ষায় ওকে উসখুস করতে দেখা যায়নি। পথ চেয়ে থাকার কোনও লক্ষণ ফুটে ওঠেনি ওর চেহারায়। ওর সদম্ভ একক যাত্রার দিকে মুগ্ধবিস্ময়ে তাকিয়েছিল বসুধা, মেয়েটা এত মনের জোর পেল কোথা থেকে?

রত্নার কাছে যাওয়ার পিছনে আলিপুরদুয়ার জায়গাটা যেমন একটা কারণ, একই সঙ্গে বসুধা দেখতে চায়, একা কতটা দাপটে বাঁচছে মেয়েটা? রত্নার থেকে একা থাকার সাহস ধার নেবে বসুধা।

ট্রেনের স্পিড একেবারেই কমে এল। দাঁড়াবে মনে হচ্ছে। জানলায় চোখ রাখে বসুধা। প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে ট্রেন। স্টেশনের নাম হাসিমারা। কুশল বলেছিল, এরপরই আলিপুরদুয়ার। ভারী অদ্ভুত ছেলে কুশল! চব্বিশ বছরের জীবনে বসুধার সঙ্গে বহু ছেলের আলাপ হয়েছে, বেশ কয়েকজনের সঙ্গে কিছুদিন স্থায়ী হয়েছে সম্পর্ক। কুশল সকলের চেয়ে আলাদা। একেবারে অন্যরকম। একই সঙ্গে আত্মমগ্ন এবং সজাগ। নিজেকে জাহির করার বিন্দুমাত্র প্রয়াস নেই। বসুধার প্রতি লক্ষ রেখেছে, আবার ছোটবেলায় দেখা হরিণশিশুটির কথাও ভোলেনি। বন্ধুর মতো ডেকে নিয়েছিল বসুধাকেও। ক'ঘণ্টারই বা আলাপ! নাম নিয়েই সে তখনও ধোঁয়াশায় আছে। তবু আহ্বানে কোনও সংশয় ছিল না। কিন্তু এত বড় ছেলের বাড়ি থেকে খালি ফোন আসে কেন! বেচারার সঙ্গে অনেক মিথ্যাচারণ করতে হয়েছে বলে খারাপ লাগছে বসুধার। শুরুটা করেছিল বাধ্য হয়েই, তারপর কেমন যেন নেশায় পেয়ে গেল। বানিয়ে-বানিয়ে কথা বলার ব্যাপারে ছোট থেকেই মাস্টার বসুধা। মা ভীষণ বকাবকি করত, মারধোরও খেতে হয়েছে। বাবা কিন্তু রাগ করত না।

মাকে বলত, "খামোকা মেয়েটাকে বকাঝকা করছ কেন? দোষ ঢাকতে ও মিথ্যে বলে না। বানিয়ে কথা বলতে ওর ভাল লাগে। এতেই বোঝা যায় ওর কল্পনা করা এবং তাকে প্রকাশ করার আগ্রহ কতটা! এর মধ্যে খারাপ কী আছে?"

মা বলত, "খুবই খারাপ স্বভাব এটা। একবার মিথ্যে থেকে সুবিধে পেতে শুরু করলে, বড় হয়ে পাক্কা ঠগবাজ তৈরি হবে।"

মায়ের অনুমান মেলেনি। বাবার প্রশয়ে বসুধা পরিচিত মহলে ইচ্ছেমতো নির্দোষ মিথ্যে চালিয়ে গিয়েছে। নিজেই যে একদিন চরমভাবে ঠকে যাবে, ভাবতেও পারেনি। প্রতারিত হওয়ার অপমান, গ্লানি থেকে বেরিয়ে আসার জন্যই আলিপুরদুয়ারে চলেছে সে। ঘটনাটা রত্নাকেও জানায়নি।

দিনপাঁচেক আগে ফোন করে বলেছিল, "তোর কাছে ক'দিনের জন্য বেড়াতে যাব ভাবছি। রোজকার রুটিনে ভীষণ বোর লাগছে। তোর কোনও অসুবিধে নেই তো? মানে এদিক-ওদিক কোথাও যাবি কিংবা বাড়ি আসার প্ল্যান আছে কি এখন?"

শুনে রত্না বলেছিল, "হঠাৎ এতদিন পর আমার কাছে আসার কথা মনে পড়ল! একা থাকি বলে? সঙ্গে কাউকে আনছিস নাকি? বিয়ে করে ফেলিসনি তো, না জানিয়ে?"

বসুধা বলেছিল, "একাই যাব।"

রত্না অত্যন্ত খুশি হয়ে কোন ট্রেনে আসতে হবে ইত্যাদি আরও সব খুঁটিনাটি তথ্য জানিয়ে দিয়েছিল।

ফোন অফ করে বাড়ির কম্পিউটারে ই-টিকিট কাটতে বসেছিল বসুধা। মা পাশ থেকে ফোনের কথা শুনেছিল।

বসুধা যখন রেলের ওয়েবসাইট ঘাঁটাঘাঁটি করছে, মা বলে, "একটা দিন ভাবার সময় নে খুকি। সব ব্যাপারে এত তাড়াহুড়ো ভাল নয়। দ্যাখ, ওরা হয়তো সত্যি কথাই বলছে। মেয়েটাই ক্ষতি করতে চাইছে তোর।"

কম্পিউটার স্ক্রিনে চোখ রেখে ট্রেন খুঁজতে-খুঁজতে বসুধা বলেছিল, "আমার কেন ক্ষতি করতে চাইবে মা? কোনও শত্রুতা ছিল না তো আমার সঙ্গে।"

মা বলে, "হতে পারে ব্যাপারটা একতরফা ছিল। মেয়েটা চাইছিল না অনুপমের বিয়ে হোক। সেই কারণেই খেলাটা খেলছিল?"

বসুধা ততক্ষণে এসি টু-টায়ারের টিকিট বুক করতে-করতে মাকে বলে, "তুমি তো দেখছি সেনবাড়ির সুরে কথা বলছ। ব্যাপারটা যদি একতরফাই হবে, মেয়েটা আমাকে ফোন করার পর ওদের খেয়াল পড়ল! সঙ্গে-সঙ্গে শোভাকে তাড়িয়ে দেওয়া হল বাড়ি থেকে!"

উত্তরে মা আর কিছুই বলতে পারেনি। বলার কিছু নেই, মা নিজেও জানে। তবু বিপর্যয়টাকে দুঃস্বপ্ন বলে ভাবার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছিল। অন্য যে-কোনও মা হলে একইভাবে ভাবত। বিয়ের কুড়িদিনও বাকি নেই। শাড়ি, গয়না কেনা হয়ে গিয়েছে। কার্ড ছাপানো হয়ে কিছু পোস্ট করাও হয়েছে।

তখন মেয়ে জানিয়ে দিল, ওবাড়িতে বিয়ে করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। যে-ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিয়েটা নাকচ করল বসুধা, রাজি করানোর মতো কোনও যুক্তি বাবা, মায়ের হাতে ছিল না।

'ভবিতব্য' মনে করে খুব কষ্টের সঙ্গে হলেও, বাবা ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে। বলেছে, "একদিক থেকে ভালই হয়েছে। বিয়ের পর এসব জানাজানি হলে আরও খারাপ হত। বিয়েটা ভাঙতই। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই।"

মা এখন ভগবানের উপর ভারী বিরক্ত। বাবার কথার পিঠে বলেছিল, "তোমার ভগবান তাহলে ওবাড়িতে বিয়েটা ঠিক করল কেন?"

বাবা উত্তর দিতে পারেনি। ঠাকুরদেবতা নিয়ে বাবার তেমন একটা ঝোঁক নেই। থাকলে, অবশ্যই একটা কারণ বলে দিত। যেমন ঈশ্বরবিশ্বাসীরা দেয়।

মা যে বিয়ের কেনাকাটিগুলো মাঝে-মাঝে বের করে দেখে, আলমারি খুললেই টের পায় বসুধা। বাক্সগুলো জায়গা পালটায়। মায়ের মনখারাপ হয় আরও। বসুধা ক'দিন আগেই বাবাকে গয়নাগুলো ব্যাঙ্কের ভল্টে রেখে আসতে বলেছিল। মা রাজি হল না গয়নাগুলো বাড়ি থেকে সরাতে। না সরানোর কোনও কারণও দেখাল না। চুপ করে রইল। আসলে অপেক্ষা করছে কোনও মিরাকলের, নির্দিষ্ট দিনেই সানাই বেজে উঠবে বাড়িতে। শোভার দেওয়ার তথ্য মিথ্যে প্রমাণ হবে। অথবা কোনও পরিত্রাতা এসে বলবে, আমি ওইদিনেই বসুধাকে বিয়ে করতে চাই। সিনেমা, উপন্যাসে হামেশাই এরকম ঘটতে দেখা যায়। বাস্তবেও যে হয় না, তা নয়। মায়ের ভরসা এখন ওইটুকুই।

এর মধ্যেই বেশ কয়েকবার বসুধাকে জিজ্ঞেস করেছে, "কলেজ ইউনিভার্সিটিতে তোর তো অনেক ছেলেবন্ধু ছিল, অল্প হলেও কাউকে কি বিশেষ পছন্দ করতিস? একবার যোগাযোগ কর না তার সঙ্গে। অফিসে সেরকম কেউ নেই? কম্পিউটারেও তো তোর অনেক বন্ধু হয়েছে, তাদের একটু আভাস ইঙ্গিত দিয়ে দেখ না। কেউ যদি ইন্টারেস্টেড হয়।"

চ্যাটফ্রেন্ডদের কথা বলছে মা। সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং-এ প্রচুর বন্ধু আছে বসুধার। একসময় অনেকের সঙ্গে চ্যাট করত। ইদানীং অফিসের দু'-একজন ছাড়া অনুপমের সঙ্গেই বিজি থাকত বেশি। মা এতসব বুঝবে না। বসুধা জানিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে, দু'বছরের আগে আমাকে বিয়ের কথা বলবে না। অনেক দেখেশুনে সম্বন্ধটা ঠিক করেছিলে। আর এখন অল্প চেনা যাকে-তাকে বিয়ে করে নিতে বলছ!

একথায় মা আঘাত পেয়েছে, বসুধা জানে। পাওয়াটা দরকার। নয়তো সত্যিটা স্বীকার করার কষ্ট আরও বাড়বে। মা বাবার জন্য খারাপ লাগে বসুধার।

ভাই কিন্তু একটুও ভেঙে পড়েনি। দুর্গাপুরের হস্টেল থেকে ফোন করে দিদিকে সমর্থন করে গিয়েছে। বলেছে, "মন খারাপ করিস না দিদি। আমার জামাইবাবু হবে পুরো হিরো। তুই শুধু একটু ঠান্ডামাথায় ওয়েট কর।"

প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে এসে বিয়ে পণ্ড হওয়াতে বসুধা মোটেই বেসামাল হয়ে পড়েনি। সত্যি বলতে কী, সে নিজেই বিয়ের ব্যাপারে মানসিকভাবে তৈরি ছিল না। এদিকে কোম্পানি সেক্রেটারিয়েট, বনেদিবাড়ির পাত্র পেয়ে বাবা-মা পীড়াপীড়ি করতে লাগল বসুধাকে। বিয়ে তো একসময় করতেই হবে, এই ভেবে রাজি হয়ে গিয়েছিল বসুধা। শর্ত হিসেবে বাবা-মাকে বলেছিল, ছেলেটার সঙ্গে দু'-চারবার মিট করার পর, যদি পছন্দ হয় আমার, তবেই তোমরা ফাইনাল কথা দিয়ো।

এখানেই সবচেয়ে বড় ভুলটা করে ফেলেছিল বসুধা। অনুপমের সঙ্গে ওই ক'দিনের মেলামেশায় কিছু নিবিড় মুহূর্ত তৈরি হয়েছিল, যা এখন শরীরে ঘেন্নার মতো লেগে আছে। এই অনুভূতিটা থেকে কিছুতেই বেরোতে পারছে না বসুধা। বেরনো নিশ্চয়ই যেত, সময় এবং ঘটনা-পরম্পরা অনুভূতির তীব্রতাকে ধীরে-ধীরে আলগা করে দিত একসময়। হঠাৎই শোভা চোখের বাইরে চলে গিয়ে গভীর সমস্যায় ফেলে দিয়েছে বসুধাকে। এ যেন অনেকটা সমুদ্রে স্নান করতে নামার আগের মুহূর্তে শোভা নিজের ব্যাগ, চটি বসুধার জিম্মায় রেখে, সেই যে গিয়েছে আর ফেরেনি। ওর জিনিসপত্রগুলো নিরুপায় হয়ে পাহাড়া দিচ্ছে বসুধা। ঘেন্নার অনুষঙ্গ রয়ে গিয়েছে সঙ্গে। এক সপ্তাহ হয়ে গেল মেয়েটা আর ফোন করে না। সেনবাড়ি থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর একবার তো ফোন করতে পারত। জানা যেত কোথায় আছে, কেমন আছে।

শোভার প্রথম ফোনটাকে কোনও গুরুত্ব দেয়নি বসুধা। সেদিন অফিসের পর মিট করেছিল অনুপমের সঙ্গে। পার্ক স্ট্রিটের একটা রেস্তোরাঁয় বসে অনেকক্ষণ ধরে খাওয়া আড্ডা হল। অনুপমের একটা ভাল হ্যাবিট, মদ ছোঁয় না। সিগারেট খুব লিমিটেড। অনুপমের সঙ্গে এক ধরনের আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরি হয়ে যাচ্ছিল বসুধার। সেদিন বাড়ি ফেরার পথে অনুপম গাড়ি করে ড্রপ করেছিল বাড়িতে। দরজা খোলার পর মা বলেছিল, "তোর একটা ফোন এসেছিল।"

"কার?"

"নাম বলেনি। একটা মেয়ে। বলেছে একঘণ্টা পর আবার করবে।"

"আমার মোবাইল নাম্বারটা দিতে পারতে।"

মা একটু ইতস্তত করে বলে, "নাম জানতে চাইলাম, বলল, আপনি চিনবেন না। ভাবলাম, অজানা অচেনা কাউকে মোবাইল নম্বর দেওয়া কি ঠিক হবে?"

বাইরের পোশাক ছেড়ে ফ্রেশ হয়ে ঘরের পোশাকে বসুধা টিভি দেখতে বসেছে, বাড়ির ফোন বেজে উঠেছিল। মা গিয়ে তুলেছিল ফোন। বসুধা ততক্ষণে ভুলেই গিয়েছে ফোন আসার কথা। রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে মা ডেকেছিল বসুধাকে। বলেছিল, "সেই ফোনটা।"

রিসিভার কানে নিয়ে বসুধা "হ্যালো" বলতে, ওপ্রান্ত জানতে চায়, "আপনি বসুধা রায় বলছেন?"

"হ্যাঁ বলছি। আপনি কে বলছেন?"

আবার সেই একই কথা, "নাম বললে চিনবেন না। খুব দরকারে ফোনটা করছি।"

"নাম জানলে কথা বলতে সুবিধে হয়। তবু বলুন কী বলবেন।"

মেয়েটি বলে, "আপনার সঙ্গে অনুপম সেনের বিয়ে ঠিক হয়েছে তো? তাকে আমি ভালবাসি, সেও আমাকে ভালবাসে। আমাদের অনেকদিনের সম্পর্ক। ওকে বিয়ে করলে আপনি সুখী হবেন না। বিয়েটা ভেঙে দিন।"

ধাক্কাটা জোরেই লেগেছিল বসুধার, ফোনটা যে এ ধরনের হবে, আশা করেনি। দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে নিরাসক্ত গলায় প্রশ্ন করেছিল, "আপনি যে সত্যি কথা বলছেন, কী করে বিশ্বাস করব? নিজের পরিচয় দিচ্ছেন না, এটা বেশ নিম্নমানের বদমাইশি মনে হচ্ছে।"

মেয়েটিকে উত্তেজিত করার জন্যই কথাটা এভাবে বলেছিল বসুধা। সে কিন্তু রাগল না। ঠান্ডা গলায় বলল, "বিশ্বাস করা না-করা আপনার ব্যাপার। বিয়ের পর সবই আপনি জানতে বুঝতে পারবেন। তখন কিন্তু আমাকে দোষ দেবেন না। ফোনটা আপনার ভালর জন্যই আমি করেছি।"

এরকম প্রত্যুত্তরের পর বসুধার মাথাটাই গরম হয়ে গিয়েছিল। গলায় ঝাঁঝ এনে বলে, "আপনারা যদি পরস্পরকে এতই ভালবাসেন, তাহলে বিয়ে করছেন না কেন?"

"অসুবিধে আছে। ওর বাড়িতে মেনে নেবে না। এখন রাখছি।"

ঝপ করে লাইন কেটে দিয়েছিল সে। বসুধা রিসিভার হাতে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়েছিল। মা ফোনের একপ্রান্তের কথা শুনেছে, উদ্বেগের কণ্ঠে জানতে চেয়েছিল, "কার ফোন, কী বলছে?"

নিজেকে সামলে নিয়ে রিসিভার নামিয়ে বসুধা চুপচাপ সোফায় এসে বসেছিল। বাবা ছিল পাশের ঘরে, মায়ের ঘাবড়ে যাওয়া গলা শুনে চলে এসেছিল এঘরে। উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, "কী হয়েছে রে, কার ফোন এসেছিল?"

উত্তর দিতে বিরক্ত লাগছিল বসুধার, মা ছাড়বে না। আরও কয়েকধাপ টেনশন বাড়িয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "বল না রে, কী বলল? চুপ করে আছিস কেন?"

অসহিষ্ণু গলায় মুখ বিকৃত করে বসুধা বলেছিল, "আরও বিয়ে কর, বিয়ে কর, ভাল পাত্র, বনেদিবাড়ি বলে লাফাও। যা হওয়ার তাই হয়েছে, ছেলের অন্য অ্যাফেয়ার আছে। মেয়েটাই ফোন করেছিল।"

কিছুক্ষণের জন্য ঘরের ঘড়িটা ছাড়া আর কেউ কোনও শব্দ করেনি। মা প্রথমে নীরবতা ভেঙে বলেছিল, "নিশ্চয়ই কেউ শত্রুতা করছে। দেখছে এত ভাল বাড়িতে বিয়ে হচ্ছে মেয়ের।"

বিস্ময়বিহ্বল হয়ে বাবা বলেছিল, "কে শত্রুতা করবে আমাদের সঙ্গে? আমরা তো কারও ক্ষতি করিনি।"

"আমাদের কেউ না-ও হতে পারে। হয়তো ওদের কোনও রিলেটিভ," বলেছিল মা।

বাবা বলে, "ওদের তাহলে এখনই ব্যাপারটা জানানো উচিত।"

মা সঙ্গে-সঙ্গে নাকচ করে দেয় প্রস্তাব। "কোনও দরকার নেই। ওদের অপমান করা হবে। এ ধরনের ভাল সম্বন্ধ যখন হয়, ভাংচি দেওয়ার জন্য উড়োফোন আসেই। কার বুকের জ্বালা ধরেছে, কী করে বুঝব! মেয়েটা নিশ্চয়ই আবার ফোন করবে। তখন বাজিয়ে দেখা যাবে। এখন ঘটনাটা আমাদের তিনজনের মধ্যেই থাক।"

বাবা আর মা নিজেদের মধ্যে আরও অনেক আলাপ আলোচনা করতে লাগল। বসুধা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে ডুবে গেল আপন জগতে। ক'দিন আগেই অনুপমের সঙ্গে শরীর খেলায় অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল। ভাগ্যিস সেটা কাচ নামানো গাড়ির ভিতর। খেলাটা পরিপূর্ণতা পায়নি। পূর্বরাগ শুরু হয়েছিল ঢাকুরিয়া লেকে। সেখান থেকে উঠে এসে পার্কিংলটে গাড়ির মধ্যে।

amarboi.com

অনুপম সুপুরুষ, বেশ একটা অ্যাপিল আছে। আদর করতে থাকলে ঘোর লেগে যায়। আলাপের পর থেকে সেদিনই তারা সবচেয়ে বেশি সাহসী হয়ে উঠেছিল। তার আগে গাড়ি চালাতে-চালাতে গালে চুমু খেয়েছে। সিনেমা দেখতে গিয়ে কম আলোর সদ্ব্যবহার করেছে অনুপম। মাথা কাছে টেনে নিয়ে ঠোঁটে চুমু খাওয়া, হাত রাখা বুকে...একদিন শাড়ি পরেছিল বসুধা, তলপেটে হাত রাখে অনুপম। ভালই লাগত বসুধার, উন্মুখ হত সমস্ত স্নায়ু। নিজের শরীরকে নতুন করে আবিষ্কার করছিল বসুধা। সেক্স এক্সপিরিয়েন্স তার খুবই কম। লেকের পাশে গাড়ির মধ্যে তারা যখন সুখানুভূতির চুড়োয় উঠতে গিয়েও পেরে উঠছে না, অনুপম বলেছিল, "চলো, কাছেই আমার বন্ধুর বাড়ি, সেখানে যাই। একা থাকে। তুমি সঙ্গে থাকলে ও যা বোঝার বুঝে যাবে। কয়েক ঘণ্টার জন্য ছেড়ে দেবে ফ্ল্যাট।"

অনুপম স্টার্ট দিয়েছিল গাড়ি। কিছুদূর যাওয়ার পর বসুধা বলেছিল, "এখন থাক না। বিয়ের পর তো পড়েই রইল সারাজীবন।"

কথাটা ছিল চক্ষুলজ্জার, শরীর তখন বসুধার বশের বাইরে। সেই সংকোচবোধকে গুরুত্ব দিয়েছিল অনুপম। বলল, "থাকবে? আচ্ছা থাক তবে।"

ওই উদারতাটুকুর জন্যই মেয়েটার ফোন পাওয়ার পরও অনুপমের উপর আস্থা হারায়নি বসুধা। মনে হয়েছিল বিয়ের ব্যাপারে ও একই সঙ্গে সিরিয়াস এবং কনফিডেন্ট। কোনও থার্ড পার্টি এসে বিয়ে ভেঙে দেওয়ার আশঙ্কা থাকলে, সেদিনের সুযোগ হাতছাড়া করত না। তাই একটা সন্দেহজনক ফোনে এতটা বিচলিত হওয়াটাও মেনে নেওয়া যায় না। বসুধা নিজেকে সংযত করে নির্দিষ্ট দিনে অনুপমের মুখোমুখি হয়।

আড্ডা, খাওয়াদাওয়ার মাঝে অনুপমকে একবার জিজ্ঞেস করে, "ধরো, বিয়ের দু'দিন আগে তুমি জানলে, আমার কোনও অ্যাফেয়ার আছে। তখন কী ডিসিশন নেবে?"

"দু'দিন আর ওয়েট করব না। ঘটনাটা জানার একঘণ্টার মধ্যে বিয়ে করে নেব তোমাকে," হাসিমুখে হাল্কা চালে বলেছিল অনুপম।

বসুধা বলেছিল, "আমার যদি সত্যিই সেরকম কেউ থাকত, আমি কনফেস করতাম। তোমার ওই ধরনের কিছু থাকলে, বলে ফেলো ভাই। বিয়ের পর ওসব হ্যাপা সামলানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

হো-হো করে হেসে অনুপম বলেছিল, "কী ব্যাপার বলো তো, হঠাৎ মাথায় এসব কথা আসছে কেন? কিছু খুচরোখাচরা প্রেম আমার জীবনে যেমন এসেছে, আশা করি তোমারও এসেছিল। কিন্তু কোনও রিলেশন ক্যারি করে বিয়ে করার মতো নির্বোধ আমরা নয়।"

কথাটা শুনে মাথাটা হাল্কা হয়ে গিয়েছিল বসুধার। সরে গিয়েছিল সদ্য ঘনিয়ে উঠতে থাকা আশঙ্কার মেঘ। বসুধার নীরবতার মাঝে ছোট্ট চিমটি কাটতে ছাড়েনি অনুপম। বলেছিল, "মেয়েরা একটু সন্দেহবাতিকগ্রস্ত হয়, এমনটাই শোনা যায়। তোমার সঙ্গে মিশে মনে হয়েছিল আমাকে অন্তত এই সমস্যায় পড়তে হবে না। এখন দেখা যাচ্ছে, অত সুখ আমার কপালে নেই।"

তারপর কথাবার্তা স্বাভাবিকভাবে হলেও, সেদিন যতবার অনুপম গায়ে হাত দিয়েছে, ছ্যাঁক করে উঠছিল শরীর। ওই একটা ব্যাপারেই আগের মতো সহজ হতে পারছিল না বসুধা। তবে বেশ নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ঢুকেছিল সেদিন। ওর মুখের ভাব, শরীরের ভাষা দেখে মা-ও বুঝি খানিকটা আশ্বস্ত হয়েছিল। বিয়ের আয়োজন নিয়ে ক'দিন আগের মতোই আলোচনায় বসেছিল মা, মেয়ে। বেজে উঠেছিল বাড়ির ফোন। সেই মুহূর্তে দু'জনেই সংশয়াকীর্ণ ফোনটার কথা বিস্মৃত হয়েছিল। বসুধা গিয়ে ফোন তোলে।

ওপ্রান্ত থেকে ভেসে উঠেছিল মেয়েটির গলা, "আপনি তো আমার কথা শুনলেন না। আজও দেখা করেছেন ওর সঙ্গে।"

"হ্যাঁ, করেছি। তো?" গলায় দাপট মিশিয়ে বলেছিল বসুধা।

মেয়েটি গলা চড়ায়নি। খানিকটা যেন অনুনয়ের সুরে বলেছিল, "আমার সঙ্গে ভালবাসা আছে জেনেও কেন আপনি ওর সঙ্গে মিশছেন! আপনার কি লজ্জা, অপমান বলে কিছু নেই। আপনাকে দেখতে সুন্দর, বড়লোক ঘরের মেয়ে, লেখাপড়ায় ভাল, পাত্রের অভাব আপনার হবে না।"

নিরুত্তাপকণ্ঠে বসুধা বলে, "প্রশংসার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আপনাকে যে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। শুধু ফোনের কথায় তো আর এতবড় ডিসিশন নেওয়া যায় না। আপনি আমার সঙ্গে দেখা করুন। গোটা ব্যাপারটা ভেঙে বলুন, তবে তো আমি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারব।"

"দেখা করার অসুবিধে আছে বলেই করছি না। বিশ্বাস করানোর জন্য এটুকু বলতে পারি, ওর নীল রং পছন্দ। আপনার জন্য বউভাতের বেনারসিটা ওই রঙেরই কিনবে। পিঠে একটা জড়ুল আছে ওর। হাঁটুর নীচে কাটা দাগ..."

মেয়েটা আরও অনেক কিছু বলে যাচ্ছিল, যেন নিরাবরণ করে দিচ্ছিল অনুপমের শরীর। বমি পেয়ে গিয়েছিল বসুধার, ফোন নামিয়ে ছুটে গিয়েছিল বাথরুমে।

টানা দেড়দিন মা জিজ্ঞেস করে গেল, "কী কথা হল? আবার কী বলছে মেয়েটা? এত গুম মেরে আছিস কেন?"

বসুধা মা-বাবাকে চিন্তায় ফেলতে চায়নি। বলেছে, "ওই একই কথা। নতুন কিছু বলেনি। আমি দেখছি ব্যাপারটা। তোমরা এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না।"

বসুধা ফোন করেছিল অনুপমকে। বলেছিল, "ফুলশয্যার শাড়ি আমি তুমি পছন্দ করে কিনব, বড়দের ওপর ছেড়ো না।"

এককথায় রাজি হয়ে গিয়েছিল অনুপম। বলেছিল, "কাল আমার সময় হবে না, চলো পরশু অফিসের পর কিনে নিই।"

মাঝখানের সময়টা 'মেয়েটি' কে হতে পারে, ভেবে গেল বসুধা। অনুপমের অভিভাবক শ্রেণির কেউ? কাছ থেকে অনেকদিন ধরে অনুপমকে দেখছে, কাটাদাগ, জড়ুল এসব বলা তার পক্ষে অত্যন্ত সহজ। কিন্তু মেয়েটির গলা শুনে মনে হল কমবয়সি। তাহলে কি কোনও আত্মীয়র মেয়ে? শরীর নিয়ে কথা বলতে কেন মেয়েটার বাধছে না? সত্যিই কি কোনও গোপন সম্পর্ক আছে দু'জনের মধ্যে? তোলপাড় চিন্তায় হাঁপিয়ে উঠেছিল বসুধা। শাড়ি কিনতে গিয়ে অস্থির ভাবটা একটু কমল। নীল নয়, কমলা বেনারসি পছন্দ করল অনুপম। মেয়েটির কথা মিলল না। আন্দাজে ঢিল মেরেছিল হয়তো।

রাতে ফের ফোন করল মেয়েটা। বলল, "কমলা বেনারসি কিনে দিয়েছে শুনলাম। আপনি ভাবলেন আমি যা বলছি, সব মিথ্যে। আসলে ও খুব চালাক। জানে, নীল বেনারসি কিনে দিলে বিয়ের সময় আমি গন্ডগোল পাকাতে পারি, আমাকে ওই রঙের শাড়িতে বিয়ে করবে বলেছিল কিনা, সেই জন্যই সাহস করেনি।"

বোঝাই যাচ্ছিল মেয়েটা ওর ঘনিষ্ঠ কেউ। সর্বক্ষণ অনুপমের উপর নজর রাখছে। বিয়ের পরও রাখবে। মেয়েটার অস্তিত্ব কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না।

যেন রিসিভার নয়, মেয়েটার হাত ধরেই কাতর গলায় বসুধা বলে উঠেছিল, "তুমি কে? আমার সঙ্গে দেখা করো। সব কিছু খুলে বলো আমায়। তবে তো বুঝতে পারব, আসল ঘটনা কী। তোমার ওপর কোনও অবিচার হোক, আমিও চাই না।"

'তুমি' সম্বোধনের জন্যও হতে পারে, অথবা বসুধার গভীর অসহায়তা বোধ করে মেয়েটি বলেছিল, "ঠিক আছে, আমি দেখা করব আপনার সঙ্গে। কিন্তু কথা দিতে হবে, ওবাড়িতে আপনি কিছু জানাবেন না।"

আশ্বস্ত করেছিল বসুধা। দু'জনের দেখা করার স্থান নির্দিষ্ট হল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ময়দানমুখো গেটে। বসুধা বলেছিল, "তুমি আমাকে কী করে চিনবে?"

সে বলেছিল, "ও আপনার ছবি আমাকে দেখিয়েছে। চিনতে অসুবিধে হবে না আমার।"

সময়ের বেশ কিছুক্ষণ আগেই ভিক্টোরিয়ার গেটে পৌঁছে গিয়েছিল বসুধা। সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়া সুন্দরী মেয়ে দেখলেই মনে হচ্ছিল, হয়তো এ-ই সে।

অতঃপর যে এসেছিল কাছে, মনের ছবির সঙ্গে কিছুতেই তাকে মেলানো যায় না। চোখটানা সুন্দরী সে নয়, আলাদা করে লক্ষ করলে তার সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। ভারী মিষ্টি দেখায়। নাক একটু চাপা, পাহাড়ি আদল। তামাটে রং। পরণে গোলাপি-হলুদ শিফন শাড়ি। জংলা প্রিন্ট। অর্ডিনারি চটি, চুলে বিউটি পার্লারের ছোঁয়া নেই, ভুরু কিন্তু প্লাক করা। মেয়েটার স্টেটাস ধরতে অসুবিধে হচ্ছিল বসুধার।

মেয়েটি কাছে এসে স্বাভাবিকভাবেই বলল, "চলুন। ভিতরে গিয়ে বসি।"

বাগানের বেঞ্চে বসে মেয়েটি বলেছিল তার জীবনকথা। নাম শোভা বড়াই। বাড়ি মাদারিহাটের লোহানি পাড়ায়। পাঁচ মাইল সাইকেল ঠেঙিয়ে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছিল। বাড়ির আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ। গ্রামের লাগোয়া চা-বাগানে কাজ করত বাড়ির বড়রা। বাগান বন্ধ হয়ে পড়েছিল অনেকদিন। গ্রামের এক কাকা ট্যাক্সি চালাত কলকাতায়, তার সঙ্গেই শোভাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল লোকের বাড়িতে কাজের জন্য। প্রথমে সল্ট লেকের এক বাড়িতে দেওয়া হয়েছিল শোভাকে। সেখানে বয়কাট চুলের গিন্নি, প্যান্টশার্ট পরেন, চাকরি করেন বড়সড়। কর্তা রাশভারী, চাকরি থেকে বাড়ি ফেরেন গিন্নির আগেই, মদের গ্লাস আর বই নিয়ে বসে যান। স্ত্রী অফিস থেকে ফিরলেই ধীরে-ধীরে শুরু হয় ঝগড়া, কোনও-কোনওদিন সেটা হাতাহাতির পর্যায় পৌঁছোয়। ওদের দু'টি পিঠোপিঠি মেয়ে। কলেজে পড়ে, ভারী বদমাইশ। ব্লু ফিল্ম দেখে টিভিতে। দু'জনের রং শ্যামলা। তুলনায় ফর্সা শোভাকে অযথা মারধোর করার পর দেখত, মারের জায়গা কতটা লাল

হয়েছে। ওদের বাড়িতে ছিল বাঘের মতো বড় একটা অ্যালসেশিয়ান। চা-বাগানে কখনও-সখনও চিতাবাঘ আসত, এখানে যেন বাঘের গুহাতেই ঢুকে পড়েছিল শোভা। একদিন লুকিয়ে বড়মেয়ের লিপস্টিক ব্যবহার করেছিল সে। ধরা পড়ে যায় দুই বোনের চোখে, বেধড়ক মারে দু'জনে। গায়ে কালশিটের দাগ আর নিজের জামা-কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে ওবাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল শোভা। যে-কাকা তাকে কলকাতায় নিয়ে এসেছিল, তার আস্তানায় কখনও যায়নি, ঠিকানা লেখা কাগজ ছিল সঙ্গে। রাস্তার লোকজনকে জিজ্ঞেস করে আস্তানায় পৌঁছেছিল শোভা। পার্ক সার্কাসের বস্তি ছিল সেটা। শোভার অবস্থা দেখে কাকা খুব কষ্ট পেয়েছিল। তার কাছেই দিন পাঁচেক ছিল শোভা। কাকার একটাই ঘর, চিলতে বারান্দা, ওখানেই রান্নাবান্না। কাকিমা মানুষটা ভাল, যতটা পেরেছে আদরযত্ন করেছে শোভার। কাকার তিনটে বাচ্চা, বড় দু'জন ছেলে। মেয়েটা কোলে। ওই একটা ঘরে কাকিমার মা-ও থাকত। ওই ক'দিনেই শোভা বুঝে গিয়েছিল, কলকাতা শুধু বড়লোকদের জায়গা নয়, তাদের গ্রামের মতো এখানেও প্রচুর অভাবী লোক থাকে।

কাকা সাতসকালে বেরিয়ে যেত, ফিরত রাতে। মালিকের ট্যাক্সি নিয়ে ভাড়া খাটত। এক দুপুরে গাড়িসুদ্ধ চলে লে। ব্যগ্রভাবে শোভার কাছে জানতে চেয়েছিল, "হ্যাঁ রে, ওবাড়ির মারের দাগগুলো এখনও আছে তো?"

কাকা কেন কথাটা জিজ্ঞেস করছে, বোঝেনি শোভা। দাগগুলো ছিল, কালচে মতো হয়ে গিয়েছিল। সেই দেখে কাকা খুব খুশি, কাকিমাকে বলল, "ওকে চাড্ডি ভাত খাইয়ে দাও। মনে হচ্ছে কাজটা হয়ে যাবে।"

কাকার সঙ্গে গাড়ি করে কালীঘাটে সেনবাড়িতে এসেছিল শোভা। বাড়ির কর্তাকে সল্ট লেকের বাড়ির সব ঘটনা বলে রেখেছিল কাকা, প্রমাণ হিসেবে মারের দাগগুলো দেখাল। সেনবাড়িতে বহাল হয়ে গেল শোভা।

পুরনো আমলের দোতলা বাড়ি। বড়-বড় ঘর, দালান, উঠোন। বাড়িটা দুই ভাইয়ের, ছোটভাই পরিবার নিয়ে বিদেশে থাকে। দোতলার অংশটা তার। ফাঁকাই থাকে, তালা দিয়ে চাবিটা রেখে দিয়েছে বড়ভাইয়ের কাছে। অত বড় বাড়িতে মাত্র পাঁচটি প্রাণী। বাবু, বাবুর বউ, বিয়ে না করা পিসি, অনুপমদা আর মেঘা। সল্টলেকের বাড়ির লোকেদের সঙ্গে এ বাড়ির মানুষগুলোর কোনও মিলই নেই। এরা সকলেই হাসিখুশি। কাজের আদেশ দেয় না শোভাকে, অনুরোধ করে। পিসি আর বাবু চাকরি করতে যায়। অনুপমদা কলেজ, মেঘা স্কুল। মেঘা প্রায় শোভার বয়সি। বাড়ির মালকিন শোভাকে মেয়ের মতোই দেখে। ক'দিনেই বাড়িটাকে ভালবেসে ফেলল শোভা। ছোটাছুটি করে কাজ করত। এই হয়তো দৌড়চ্ছে দালান উঠোনে, পরক্ষণেই লাফিয়ে সিঁড়ি পার হয়ে ছাদে। শুকোতে দেওয়া কাপড়-জামাগুলো তুলতে-তুলতে ঠাহর করার চেষ্টা করত, তার গাঁটা কোনদিকে, সল্ট লেকটাই বা কোথায়? মনে হত ওগুলো দুঃস্বপ্ন। জন্মের পর থেকে অনেকদিন ঘুমিয়ে ছিল, হঠাৎই জেগে উঠেছে এই বাড়িতে।

মালকিন সব সময় পরিষ্কার থাকতে বলত শোভাকে। মেঘার একটু পুরনো হয়ে যাওয়া জামা পরতে দিত। বিছানায় বা সোফায় বসাও বারণ ছিল না শোভার। নতুন কোনও অতিথি এলে ধরতেই পারত না শোভা এবাড়ির কাজের মেয়ে। তা নিয়ে এবাড়ির লোকজনের ভারী গর্ব ছিল।

দুপুরে মামির সঙ্গে লুডো খেলত অথবা পাশে বসে সিরিয়াল দেখত। মেঘা, অনুপমদা স্কুল কলেজ থেকে ফিরলে ক্যারম। মামাবাবু, পিসিও বসে যেত মাঝে-মাঝে। এত আনন্দের মধ্যেও একটা ভয় তাড়া করে বেড়াত শোভাকে, অনুপমদার সঙ্গে তার ব্যাপারটা বাড়ির বাকিরা যদি জেনে যায়, কী হবে! তখনই নিশ্চয়ই তাড়িয়ে দেবে এরা।

বাড়িটার কত আনাচকানাচ, অনুপমদা সুযোগ পেলেই টেনে নিত তাকে। পাগলের মতো আদর করত। প্রথম-প্রথম বাধা দিত শোভা, অনুপমদা কোনও কিছুই শুনবে না। মালিকের ছেলে হয়ে পায়ে পড়ে যায় আর কী!

অনুপমদাকে প্রথমদিন দেখেই শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছিল শোভার। মনে-মনে ধমকেছিল নিজেকে। বুঝিয়েছিল, অন্নদাতার ছেলেকে নিয়ে এসব ভাবতে নেই। পাপ হয়। এখন সেই ছেলে যদি নিজেই পীড়াপীড়ি করে, শোভা কী করতে পারে!

চাকরিতে ঢুকল অনুপমদা। সতর্ক হয়েছিল শোভা। কাছে ঘেঁষতে দিত না তাকে। কিন্তু সে নাছোড়। শোভা বলত, "আর ক'দিন পরেই তোমার বিয়ে-থা হবে। এসব ঠিক নয়।"

অনুপম কথা দিয়ে বসল, বিয়ে করলে, শোভাকেই করবে। সে আর কোনও মেয়েকেই ভালবাসতে পারবে না।

শোভার মনের বাধা দূর হয়ে গেল। নিজের সমস্ত কিছু উজার করে দিতে লাগল অনুপমদাকে। পরিপূর্ণ সুখ দেওয়া-নেওয়াতে দু'জনেই তখন বেশ পারঙ্গম। বাচ্চাকাচ্চা যাতে না হয়ে যায়, সেদিকটা অনুপমদাই খেয়াল রাখত।

বিয়ে হয়ে গেল মেঘার। অনুপমদার জন্য পাত্রী দেখা শুরু হল। অস্থির হয়ে উঠেছিল শোভা। অনুপমদাকে বলল, "তুমি বারণ করো মেয়ে দেখতে।"

অনুপমদা বলেছিল, "দেখছে, দেখুক। আমি সব ক্যানসেল করে দেব।"

সেরকমই করছিল, বসুধার বেলায় দুম করে রাজি হয়ে বসল।

শোভা ধরেছিল অনুপমদাকে, "এটা কী হল! এরকম তো কথা ছিল না। আমি কিন্তু বাড়িতে সব ফাঁস করে দেব।"

অনুপমদা বলেছিল, "মাথা গরম করিস না। মায়ের শরীর খারাপ, এখন আমাদের সম্পর্কের কথা বললে ভালমন্দ কিছু হয়ে যাবে। বিয়েটা হতে দে, বউকে আমি যে-কোনও অজুহাতে তাড়াবই। তারপর তুই আর আমি যেমন আছি থাকব।"

প্রস্তাবে সমর্থন জানায়নি শোভা। বলেছিল, "কেন তুমি অযথা একটা মেয়ের জীবন নষ্ট করবে। তার চেয়ে চলো দু'জনে পালাই। আলাদা বাসা ভাড়া করে থাকি।"

অনুপমদা তখন যুক্তি তুলল, "আমি চলে গেলে মা-বাবাকে কে দেখবে? এক ছেলে হওয়ার এই হল জ্বালা। দু'জনেরই বয়স হয়েছে। ছেলের কেলেঙ্কারি একজন হয়তো সহ্য করতে পারল না, খারাপ কিছু একটা ঘটে গেল। আমি তখন নিজের কাছে কী জবাব দেব?"

শোভা আর কিছু বলেনি। তখনই ঠিক করে, বসুধাকে ফোন করে সতর্ক করবে। নিজের সুখের জন্য অন্য একজনের সর্বনাশ হয়ে যাক শোভা চায় না।

ঘটনা কিছুদূর শুনেই অনুপমকে বিয়ে না করার সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছিল বসুধা। পুরোটা শোনার পর শোভার জন্য চিন্তা হচ্ছিল খুব।

ওকে বলে, "আমি না হয় ওবাড়িতে বিয়ে করলাম না। কিন্তু তুমি কত পাত্রীকে এভাবে ঠেকাবে? অনুপম যে তোমায় কোনওদিনই স্ত্রীর মর্যাদা দেবে না, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ।"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শোভা বলেছিল, "সবই বুঝতে পারি। কিন্তু আমার কিছু করার নেই। যতদিন পারব, চেষ্টা করব বিয়ে আটকানোর।"

"কিছু করার নেই কেন? যখন জানোই লোকটা তোমাকে ভালবাসে না, ওবাড়ি থেকে বেরিয়ে এসো।"

"বেরিয়ে এসে কোথায় যাব। সেই তো আর একটা বাড়িতে ঝি-গিরিই করতে হবে।"

বসুধা বলে, "তুমি দেশে ফিরে যাও। বিয়ে-থা করে নতুন করে জীবন শুরু করো।"

অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল শোভা। ভিক্টোরিয়ার বাগানে তখন কত ছেলেমেয়ে জোড়ায়-জোড়ায় ঘুরছে, গাছতলায় বসে খুনসুটি করছে। পরিবার নিয়েও বেড়াতে এসেছে অনেকে। বাচ্চারা দৌড়োদৌড়ি করছে।

শোভা বলে, "সেই যে দেশ থেকে এসেছিলাম কাকার সঙ্গে, তারপর বাড়ির লোক আমার খবর নেয়নি, আমিও নিইনি। দেশের কাকা আর কখনও খোঁজ নিতে আসেনি কালীঘাটের বাড়িতে। জানে, ভালই আছে। বিপদে পড়লে ঠিকই তার কানে গিয়ে পৌঁছত। এত বছর লোকের বাড়ি কাজ করে, এখন যদি দেশের বাড়ি যাই, গ্রামের লোক ভাল চোখে দেখবে না। ধরে নেবে এঁটো হয়ে গিয়েছে। পাত্র পাওয়া যাবে না আমার। দেশের কথা খুবই মনে পড়ে। জ্যোৎস্নাপুজোর সময় প্রতিবারই গ্রামের জন্য মনটা বড় টানে। খুব মজা হয় ওই পুজোয়।"

"জ্যোৎস্নাপুজো! প্রথমবার শুনলাম। কীরকম পুজো সেটা?"

শোভা বর্ণনা দিয়েছিল, "তোমাদের এখানে যেদিন কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো হয়, আমাদের গ্রামে ওটাই জ্যোৎস্নাপুজো। কোনও মাটির ঠাকুর থাকে না। সন্ধে নামার মুখে থালায় ফুল নৈবেদ্য সাজিয়ে গ্রামের মেয়েরা খাউচন নদীর পাড়ে যায়।"

নদীর নামটা একেবারেই অজানা।

শোভা বলে যাচ্ছিল, "পুরুতঠাকুরের সামনে নৈবেদ্যর থালা রাখা হয়। নদীর ওপারে জঙ্গলের মাথায় তখন পূর্ণিমার গোল চাঁদ। ঠাকুরমশাই সেইদিকে মুখ করে পুজো করে যান। সারারাত ধরে চলে পুজো। গ্রামের মেয়েরা নাচগান, হাসি-ঠাট্টা করে। ছেলেরা থাকে দূরে। এই পুজোটা মেয়েদের। ছেলেদের কোনও কাজ নেই। অনেক আগে পুজো চলাকালীন নাকি নদী থেকে উঠে আসত রাজহাঁস। কোথা থেকে আসত, কেউ জানে না। সেই হাঁস যে-মেয়ের নৈবেদ্যর থালায় মুখ দিত, তাকেই সবচেয়ে পুণ্যবতী মানা হত। পরের পুজো পর্যন্ত রানির মতো তাকে মাথায় করে রাখত গ্রামের লোক। এসব অবশ্য শোনা কথা, আমি তো নয়ই, ঠাকুমাও দেখেনি। ঠাকুমার মা নাকি দেখেছিল।"

বসুধা জানে এগুলো আসলে মিথ, গল্পকথা। তবু বিশ্বাস করতে বড় ইচ্ছে হয়।

পুজোর বর্ণনা দেওয়া তখনও শেষ হয়নি শোভার। বলে যাচ্ছিল, "রাজহাঁস না দেখলে কী হবে, আমাদের পুজোর শেষটা এখনও দারুণ।

amarboi.com

ভোররাতে প্রদীপ জ্বালিয়ে ভাসিয়ে দিই নদীর জলে। খাউচন নদীতে ভীষণ স্রোত। যে-মেয়ের প্রদীপ বেশিক্ষণ জ্বলে থাকে, তার কপাল খুব ভাল। আমরা হাঁ করে বসে থাকতাম ভেসে যাওয়া নিজের-নিজের প্রদীপের দিকে তাকিয়ে।"

ভিক্টোরিয়ার গাছে তখন ফিরে আসছে পাখিরা। একটা একটা ভেপার-ল্যাম্প জ্বলে উঠছে, এসবের মধ্যেই শোভার চোখের মণিতে জ্যোৎস্নাপুজোর প্রদীপ ভাসতে দেখেছিল বসুধা।

বাড়ি এসে ফাইনালি বাবা, মাকে বসুধা জানিয়ে দেয়, অনুপমকে সে বিয়ে করবে না। অনুপম, শোভার সম্পর্কটাও ছোট করে বলে। কিছুক্ষণের জন্য বাবা, মা পাথরের মতো হয়ে গিয়েছিল।

প্রথম মুখ খুলেছিল বাবা। গভীর সংশয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "ওদের বাড়িতে তাহলে কী বলব? শোভার নাম করা যাবে না, মেয়েটাকে হেনস্থা করে মারবে ওরা।"

বসুধা বলেছিল, "তুমি বলে দাও, মেয়ের একটা অ্যাফেয়ার ছিল। আগে আমাদের জানায়নি। এখন বলছে ওই ছেলেটাকেই বিয়ে করবে।"

বাবা বেঁকে বসল। বলল, "নিজের মুখে মেয়ের এতবড় বদনাম আমি করতে পারব না।"

বসুধার মাথায় তখন কিছুই আসছে না। বলেছিল, "ঠিক আছে, তুমি ছেড়ে দাও। যা বলার আমিই বলব।"

পরের দিন অনুপমকে ফোন করে বিয়ে ক্যানসেল করার কথা বলেছিল বসুধা। কারণ হিসেবে বাবাকে যা বলতে বলেছিল তাই বলে দেয়।

উত্তরে অনুপম হেসে উঠে বলেছিল, "তুমি মিথ্যে কথা বলছ বসুধা। মাথায় কিছু একটা চেপেছে।"

"এত শিওর হচ্ছো কী করে?" জানতে চেয়েছিল বসুধা।

অনুপম বলেছিল, "মুখোমুখি মিথ্যে বলা আমি যতটা না ধরতে পারি, ফোনের মিথ্যে একচান্সে ধরে ফেলি। অফিসের কাজ তো সারাক্ষণ ফোনের মাধ্যমেই চালাতে হয়।"

চালবাজি দেখিয়ে প্রসঙ্গের গুরুত্ব কমাতে চাইছিল অনুপম, বসুধাকে বাধ্য হয়ে কড়া কথায় যেতে হয়। বলেছিল, "বিয়ের পর যদি কোনও ছেলে তোমায় ফোন করে বলে, আপনার বউয়ের অমুক জায়গায় তিল জড়ুল আছে, সহ্য করতে পারবে তো?"

ধাক্কাটা ভালই লেগেছিল অনুপমের। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল, "সিরিয়াস ডিসকাশন এভাবে হয় না। সন্ধেবেলা তোমাকে অফিস থেকে পিকআপ করছি। কোথাও বসে আলোচনা করা যাবে।"

"আমি আজ অফিস যাইনি। কোনওদিন তোমার সঙ্গে দেখা করব না। ফোনও কোরো না," বলে লাইন কেটে দিয়েছিল বসুধা। তখন বোঝেনি রাগের মাথায় কত বড় ভুল সে করে বসেছে!

বুঝতে পারল দু'দিন পর। মাঝের সময়টাতে বহুবার মোবাইলে অনুপমের নাম ফুটে উঠেছে। লাল সুইচ টিপে গিয়েছে বসুধা। একসময় মোবাইলটা বন্ধ করে দিয়েছিল। দু'দিন বাদে বাড়ির ফোনে কল করলেন বিশ্বদীপ সেন। অনুপমের বাবা।

ফোন তুলেছিল বসুধা, স্নেহসিক্ত গলায় বিশ্বদীপবাবু বলেছিলেন, "ভাল আছো তো মা? অফিস যাচ্ছ?"

"যাচ্ছি," বলে পরবর্তী অপ্রিয় প্রসঙ্গের জন্য তৈরি হচ্ছিল বসুধা।

"বাবা বাড়িতে আছেন? না থাকলে মাকেও দিতে পার।"

বাবা বাড়িতে থাকবে আন্দাজ করেই সাতসকালে ফোনটা করেছিলেন বিশ্বদীপবাবু। ফোনে বাবার সঙ্গে যা কথা হল, মোটামুটি এরকম—ওঁরা বুঝতে পেরেছেন শোভাই ফোন করে বিয়েটা ভেঙেছে। নিজের মেয়ের মতো মানুষ করা হয়েছে ওকে। সে যে এতবড় সর্বনাশ করার চেষ্টা করবে, ভাবতে পারেননি ওঁরা। মেয়েটা সত্যিই অনুপমের প্রতি দুর্বল কি না, নিশ্চিত নন। সেরকম কোনও আভাস-ইঙ্গিত কখনও পাননি। অনুপমও পায়নি। হতে পারে মেয়েটা অন্য কোনও কারণে এরকম করল। যাই হোক, বিষয়টা ধরতে পেরে ওঁরা শোভাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন, এখন বিয়ে নিয়ে আর কোনও সমস্যা রইল না।

বাবা এমনই ভোলাভালা লোক, "ঠিক আছে, মেয়ের সঙ্গে কথা বলে দেখছি," জানিয়ে রেখে দিয়েছিল ফোন। পরোক্ষে যে শোভার ফোন করার ব্যাপারটা স্বীকার করা হয়ে গেল, বুঝতে পারল না।

বাবার ভুল ভাঙানোর পরিশ্রম করেনি বসুধা। ভাবতে বসেছিল, কী করে ওঁরা ধরে ফেললেন শোভাকে? মেয়েটা মরিয়া হয়ে নিজেই সব বলে দিল? সে এখন গেল কোথায়?

একসময় বসুধার খেয়াল পড়ল নিজের ভুল। বসুধার জন্যই মেয়েটাকে ও বাড়ি থেকে চলে যেতে হয়েছে। কেন যে স্মার্টগিরি দেখাতে গিয়ে অনুপমকে জড়ুলের ব্যাপারটা বলেছিল! ওই শব্দটা শুনেই বাকিটা কানেক্ট করে নিয়েছে অনুপম। চোরের মন, তাই প্রথমেই শোভাকে গিয়ে ধরেছে, কথার চাতুরিতে বলিয়ে নিয়েছে সব।

অনুপমের ইচ্ছেপূরণ অবশ্য কখনওই হবে না। বসুধা মোটেই রাজি হবে না বিয়েতে। শোভার প্রতিটি কথা যে সত্যি, এটা বোঝার জন্য আলাদা করে মাথা খাটানোর কিছু নেই। খুব ঠেকায় না পড়লে কোনও মেয়েই নিজের যৌনসম্পর্কের কথা উগড়ে দেয় না। অতটা নিখুঁত কল্পনা করার শক্তি বা বুদ্ধি শোভার নেই। শিক্ষার সুযোগই পায়নি সে। মেয়েটার জন্য চিন্তায় পড়ে গেল বসুধা, কার কাছে গেল? কী করছে! অনুপমদের বাড়িতে অপমানের জীবন কাটালেও, একটা নিরাপত্তা ছিল। বসুধার জন্য আরও বড় কোনও বিপদের মধ্যে পড়ে গেল না তো?

একটা করে দিন কাটতে থাকে, বসুধা রোজই ভাবে, আজ নিশ্চয়ই শোভার ফোন আসবে। ক্রমশ অস্থিরবোধ করে বসুধা। নানা কুচিন্তা চলে আসে মাথায়, মেয়েটাকে ওরা খুনটুন করে দিল না তো? পরক্ষণেই মনে হয়, আমি বেশিই ভাবছি। খুন হয়ে যাওয়ার মতো কাণ্ড মেয়েটা ঘটায়নি। একটা সম্বন্ধ আটকেছে মাত্র। আরও কত আসবে। হতে পারে শোভাকে বেশ কিছু টাকাকড়ি দিয়ে ওরা বিদায় করেছে। শোভা ফিরে গিয়েছে নিজের গ্রামে। এই সম্ভবনাটা মাথায় আসার পর থেকেই বসুধা ভাবতে থাকে, একবার শোভাদের গ্রামে গেলে কেমন হয়! ওখানে গেলে শোভাকে যে পাওয়া যাবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। ওদের বাড়িতে পৌঁছনোও বেশ কঠিন। শুধু গ্রামের নামটুকু জানে বসুধা। আর শুনেছে খাউচন নদীর কথা। দেখা পাওয়ার সম্ভবনা কম জেনেও শোভাদের গ্রাম ভীষণভাবে টানছিল বসুধাকে।

ওখানে যাওয়া মানে শোভার নির্মল, শুদ্ধ বয়সটার কাছে পৌঁছনো। যখন ওর শরীরে শহরের লালা, থুতু লাগেনি। একই ক্লেদ এখন বসুধার শরীরে। শোভাদের গ্রাম লোহানিপাড়ায় পৌঁছলে গা থেকে ঘেন্না ভাবটা হয়তো কেটে যাবে। ওদের গ্রামের কী অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছিল শোভা। ওখানে জ্যোৎস্নাপুজো হয়।

এমনও অবশ্য হতে পারে, সেনবাড়ি থেকে বেরিয়ে শোভা প্রথমে পার্ক সার্কাসে ওর কাকার কাছে গিয়েছে। অবশ্য সেখানকার ঠিকানা বসুধা জানে না। নানাদিক চিন্তাভাবনা করে, বসুধা ডুয়ার্স যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। রত্না যেহেতু আলিপুরদুয়ারে থাকে, বসুধার খুব সুবিধেই হবে। ওর ওখানে থানা গেড়ে শোভাদের গ্রাম খুঁজতে বেরোবে। সঙ্গে নেবে রত্নাকে, বলবে, "আমার জন্য ক'দিন ছুটি নে কলেজ থেকে।"

অবশ্য বাবা, মা বা রত্না কেউই তার আলিপুরদুয়ার যাওয়ার আসল কারণটা জানে না।

এর মধ্যে অনুপম বসুধার মোবাইলে ফোন করা থামায়নি। একটা কলও রিসিভ করেনি বসুধা। গত পরশু বাড়িতে ফোন করেছিল অনুপম। ঘটনাচক্রে বসুধাই ফোন তোলে।

অনুপম প্রথমেই বলে ওঠে, "অ্যাট এনি কস্ট, বিয়ে আমি ভাঙতে দেব না।"

মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল বসুধার। বলেছিল, "মানে! গাজোয়ারি নাকি?"

"হ্যাঁ, তাই। আত্মীয়স্বজন সকলেই বিয়ের খবর জানে। ইনভিটেশন কার্ড পেয়ে গিয়েছে অনেকে। তোমার কোনও রাইট নেই আমাদের এইভাবে অপমান করার।"

"দুশ্চরিত্র ছেলেকে যে-পরিবার প্রশয় দেয়, তাদের আবার মান-অপমান!" শ্লেষের হাসিসহ বলেছিল বসুধা।

ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল অনুপম, "শাট আপ। কোন একটা উটকো মেয়ের কথা শুনে তুমি এ ধরনের কমেন্ট করতে পার না।"

"দশ বছর ধরে তাকে সবরকমভাবে ব্যবহার করার পর বলছ উটকো মেয়ে! মেয়েটাকে এতই ভয় যে, তাড়িয়ে দিতে হল!"

অনুপম কিছু বলে ওঠার আগে ফের বসুধা বলে, "আর শোনো, আমাকে ধমকানোর চেষ্টা কোরো না। বেশি বাড়াবাড়ি করলে আমি কিন্তু পুলিশের সাহায্য নেব।"

গলা সপ্তমে চড়িয়ে অনুপম বলে, "আই ডোন্ট কেয়ার থানা-পুলিশ। ওইদিন যদি বিয়েতে রাজি না হও, আই ক্যান ডু এনিথিং।"

অনেক কথা মুখে চলে আসা সত্ত্বেও বলার ইচ্ছে হয়নি বসুধার। "গো টু হেল," বলে রেখে দিয়েছিল রিসিভার।

মুখ তুলে দেখে বাবা, মা আতঙ্কের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে। বসুধা বলে, "এত ভয় পাচ্ছ কেন? দোষ যেন আমাদেরই। শোনো, ও আমার কিচ্ছু করতে পারবে না। সেটা জানে বলেই আড়াল থেকে ধমকাচ্ছে।"

বাবা, মা'র দুশ্চিন্তা কতটা লাঘব হয়েছিল, বোঝা যায়নি। তবে দু'জনে সরে গিয়েছিল সামনে থেকে।

তার দু'দিন আগেই ট্রেনের টিকিট বুক করেছিল বসুধা, অনুপমের ফোনের পর মা বলতে শুরু করল, "অতদূর একলা যাবি। রাস্তায় যদি চড়াও হয় ওরা? কোনও ক্ষতি করে দেয়?"

"কিচ্ছু করবে না। সামাজিক সম্মান ওদের কাছে অনেক দামি। দেখছ না, বিয়ে পণ্ড হওয়াতে কেমন পাগল-পাগল হয়ে গিয়েছে। শোভাকে তাড়াল, আমাকে ধমকাচ্ছে। আবার এটাও জানে, বেশি বাড়াবাড়ি করলে আমি পুলিশ, প্রেস টেনে আনব। সম্মান হারানোর ভয় ওখানেও আছে। তাই বেশি দূর এগোবে না।"

বসুধার কথায় খানিকটা আশ্বস্ত হয়েছিল মা। শুধু ফোনে যোগাযোগ রাখতে বলেছিল।

সেটাও সম্ভব হয়নি। স্টেশনে ঢোকার মুখে এক বয়স্ক দম্পতিকে দেখে হোঁচট খেয়েছিল বসুধা, চেনা লাগছিল ভীষণ। একটু ভাবতেই মনে পড়ে যায়, অনুপমের মাসি আর মেসো। লেক রোডে থাকে। মেয়ে দেখতে অনুপমের বাবা-মা'র সঙ্গে এসেছিল। ওদের বাড়ি থেকে বসুধাকে একবারই দেখতে এসেছে। অনুপমের সঙ্গে বসুধা মিট করেছিল পার্ক স্ট্রিটের একটা রেস্তোরাঁয়।

সেই মাসি, মেসোর চোখ এড়াতে ভিড়ের আড়ালে চলে গিয়েছিল বসুধা। এদিকে ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে আসছে। ওরা কোন ট্রেনে যাবে, বোঝা যাচ্ছে না। দূরযাত্রা নিশ্চয়ই, সঙ্গে অনেক মালপত্র। হতেই পারে, বসুধা যে-ট্রেনে যাবে, তারাও সেটাতেই উঠবে।

তা বলে এক কামরাতেই রিজার্ভেশন থাকবে, এতটা সমাপতন আশা করেনি বসুধা। ট্রেন ছাড়ার শেষ মুহূর্তে দৌড়ে গিয়ে এসি টু-টায়ারে ওঠে। কামরার দরজা ঠেলতেই মাসি, মেসোর মুখোমুখি। প্রথম সাইড বার্থে বসে আছে দু'জনে।

অনুপমের মাসি তো একেবারে লাফিয়ে উঠল, "আরে, বসুধা না! কোথায় যাচ্ছ?"

মুহূর্তে বসুধার মাথায় চলে আসে, এরা তাকে শাড়িতে দেখেছে, এখন পরনে জিন্‌স। পরিচয় গোপন করার একটা চেষ্টা করা যেতে পারে। ওদের দেখে যে থতমত ভাবটা চলে এসেছিল বসুধার চোখমুখে, সেটাকেই অভিনয়ের কাজে লাগিয়ে বলেছিল, "আপনাদের ভুল হচ্ছে, আমি বসুধা নই।"

মেসো অবাক হয়ে বলে উঠেছিল, "সে কী, এত মিল! তুমি সত্যিই পাইকপাড়ার বসুধা নও।"

যথাসম্ভব মিষ্টি হেসে বসুধা বলেছিল, "না, আমি নীলা। নীলা বসু। রাসবিহারীতে থাকি।"

ওই নামটাই হঠাৎ কেন মুখে চলে এসেছিল, জানে না বসুধা। ওই নামটাই কুশলের কাছে চালিয়ে দিল বসুধা। কুশলের সাহায্য ভীষণ দরকার ছিল। মাসি-মেসোর মুখ দেখেই বসুধা বুঝেছিল, ওরা পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি তাকে। যাত্রাপথে সব সময় নজর রাখবে। অপরিচিত কাউকে নিজের লোক বানিয়ে নিলে, সন্দেহের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে।

গন্ডগোলে পড়ে মাকে ফোন করার কথা ভুলেই গিয়েছিল বসুধা। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর মা নিজেই করেছিল। বসুধা ট্রেনে সমস্যার কথা জানিয়ে বলেছিল, "তুমি মাঝে আর ফোন কোরো না। ওরা আড়ি পাততে পারে। রত্নার বাড়ি পৌঁছে আমিই ফোন করব।"

অনুপমের মাসি-মেসোর কাছে নিজের পরিচয় দিতে এমনিতে কোনও বাধা নেই বসুধার। ঝামেলা এড়াতে রাস্তাটা নিয়েছিল। বসুধা চায় না, দু'জনের মারফত অনুপম তার গন্তব্য জানুক। বিয়ের জন্য যে-তারিখ ঠিক হয়েছে, সেটা পার করেই বসুধা কলকাতায় ফিরবে। এর মাঝে অনুপম যেন তাকে ধাওয়া না করতে পারে, তার জন্যই এই সতর্কতা।

সেটা কতটা কাজে এল, কে জানে! যাত্রাপথে মাসি-মেসো বেশ কয়েকবার বার্থের সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা করেছে, ভাল করে দেখেছে বসুধাকে। সন্দেহ নিরসন হয়নি বলেই মনে হয়। শেষে যখন এনজেপি-তে নেমে যাচ্ছে, ভদ্রলোক অদ্ভুতভাবে হেসেছিল বসুধার দিকে তাকিয়ে। বিয়ে নিয়ে গোলমালটা সম্ভবত ওদের কানে পৌঁছয়নি। নয়তো এত সহজে ছেড়ে দিত না।

জার্নিটা মোটের উপর ভালই কাটল তার। কুশলের সঙ্গে আর কি দেখা হবে? চান্স কম। মেসেজের উত্তরও দিল না।

একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রেনের গতি কমতে শুরু করল। জানলার বাইরে তাকায় বসুধা, শহরাঞ্চলে এসে পড়েছে ট্রেন। তার মানে আলিপুরদুয়ার এসে গেল। রত্না বলেছে স্টেশনে থাকবে।

বসুধা এখন রিকশায়। রত্না স্টেশনে আসেনি। ওর ফোন এসেছিল।

বলল, "একটা ঝামেলায় পড়ে গিয়েছি। স্টেশনে যেতে পারছি না। তুই একটা রিকশা নিয়ে চলে আয়। ঠিকানা মনে আছে তো?" জিজ্ঞেস করার পর ফের জায়গাটা বলে দিয়েছিল, "বলবি রেলওয়ে ইন্সটিটিউট হলের পিছনে। কর্নেল মজুমদারের বাড়ি। আমি একতলাটায় থাকি।"

"তুই কি এখন বাড়িতে নেই?" সামান্য উদ্বেগ নিয়ে জানতে চেয়েছিল বসুধা।

রত্না বলল, "আছি।"

"তাহলে এলি না কেন স্টেশনে?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল বসুধা।

রত্না বলেছে, "কারণ আছে। আয় বলছি।"

অযথা সাসপেন্সে রেখে দিল রত্না। রাস্তা যদিও বেশি নয়।

রিকশায় বসে দু'পাশের দোকানপাট, বাড়িঘর দেখতে-দেখতে চলেছে বসুধা। আলিপুরদুয়ার যথেষ্ট উন্নত শহর। অনেক মানুষজনও চোখে পড়ছে। কারও-কারও মুখে মঙ্গোলিয়ান ছাপ। শোভার যেমন ছিল। এদের দেখে বসুধার মনে হচ্ছে, শোভাদের গ্রাম খুব দূরে নয়।

একটা সাদা দোতলা বাড়ির সামনে দাঁড়াল রিকশা। গেটের পাশে পাথরের উপর লেখা, মজুমদার ভিলা।

রিকশা থেকে নেমে ভাড়া মেটায় বসুধা। গেট খুলে ভিতরে ঢোকে। একতলায় গ্রিল ঘেরা বারান্দা, সেখানে পৌঁছে কলিংবেল টিপতে যাবে, দরজা খুলে যায়। একমুখ হাসি নিয়ে রত্না।

বসুধা হাসতে পারে না, ওর চোখ চলে যায় রত্নার পায়ে। ম্যাক্সির তলায় প্লাস্টার করা ওর বাঁ পা দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ শোভার গ্রাম খুঁজতে একাই বেরোতে হবে বসুধাকে।

বেড়ালবাচ্চাটা তখন থেকে লাফিয়ে-লাফিয়ে প্রজাপতিটাকে ধরার চেষ্টা করে যাচ্ছে, পারছে না। পারার কথাও নয়। মামাবাড়ির দালানে বসে দৃশ্যটা দেখে ভারী আনন্দ হয় কুশলের। বেড়ালটার লেজ আবার বড্ড ছোট, টিকির মতো। ওকে দেখে তাই বেশি হাসি পাচ্ছে। কুশল জানে, বেড়ালটা প্রজাপতি ধরতে কৃতকার্য হবে না। সেই জন্যই দৃশ্যটা নির্মল, কোনও হিংস্রতা নেই।

দৃশ্যটা তার মনকে ব্যস্ত রাখলেও, একরাশ প্রশ্ন তার মাথায় ভিড় করে আসছে। বড়মামা কেন ওরকম বলল? বড়মামা মিথ্যে খবর দিয়ে ডেকে পাঠিয়ে কুশলকে এইসব প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

"দাদা, তোমার খাবার।" কুশলের পাশে থালা, জলের গ্লাস নামিয়ে বলল রাখি। তারপর বসে পড়ল দালানে।

কুশল থালার দিকে তাকায়, পরোটা আলুভাজা আর একটা সন্দেশ। জলখাবার।

থালাটা কোলে তুলে নেয় কুশল। রাখি এখন উঠোনের দিকে তাকিয়ে বেড়াল, প্রজাপতির খেলা দেখছে। ছোটমামার মেয়ে রাখি, ষোলো-সতেরো বছর বয়স। গতকাল প্রথম দেখল কুশলকে। কলকাতায় এক পিসতুতো দাদা থাকে, এইটুকু শুধু জানত। ফোন মারফতও কোনওদিন কথা হয়নি। অথচ কাল থেকে একেবারে নেওটা হয়ে গিয়েছে। কুশলের দেখাশোনা সব ও-ই করছে। যেন কতদিনের চেনা। আত্মীয়তায় বন্ধন কি এরকমই, সাক্ষাৎ ছাড়াই একটা টান থেকে যায়?

"জানো তো দাদা, এটার মতো দস্যি আর একটাও জন্মায়নি আমাদের বাড়িতে। দেখছ, কেমন করছে!" উঠোনের দিকে তাকিয়ে বেড়ালবাচ্চাটার কথা বলল রাখি।

পরোটা খেতে-খেতে কুশল বলে, "বাচ্চাটার লেজটা ওরকম কেন রে, এত ছোট! জন্ম থেকেই?"

"না গো, যখন একদম পুচকি, বেজিতে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, বড়জেঠু দেখতে পেয়ে ছুটে যায়। লাঠি দিয়ে তাড়ায় বেজিটাকে। তখনই বেজির মুখে ওর লেজটা গিয়েছে।"

রাখি থামতেই রান্নাঘর থেকে কোনও এক মামির ডাক ভেসে এল, "রাখি, একবার শুনে যা।"

মামিদের গলা এখনও আলাদা করতে পারেনি কুশল। রাখি উঠে গেল। পরনে বেশ পুরনো সালোয়ার-কামিজ। বাবা বললেও, এবাড়িতে ফল-মিষ্টি নিয়ে ঢোকেনি কুশল। রাখির পোশাক দেখে সে সিদ্ধান্ত নিল, এবাড়ির সকলের জন্য একসেট করে কাপড়-জামা কিনবে। কারওর পোশাকই তেমন জুতের নয়।

ফল-মিষ্টি ইচ্ছে করেই আনেনি কুশল। বড়মামাকে কতটা খারাপ অবস্থায় দেখবে, আদৌ দেখা যাবে কি না, জানে না। হাতে ফল-মিষ্টি নিয়ে তখন বিড়ম্বনার একশেষ। গেটের মুখে সুস্থ এবং কর্মঠ বড়মামাকে দেখে এতটাই

anandalok.com

হকচকিয়ে গিয়েছিল কুশল, প্রণাম করতেই ভুলে যায়। বড়মামা তাকে ভিতরে নিয়ে যেতে-যেতে বলেছিল, "খুব দরকারে তোকে ডেকে পাঠিয়েছি। প্রয়োজনটা তোরই। এভাবে না ডাকলে তুই হয়তো আসতিস না।"

কথা শেষ করে বড়মামা গলা তুলে বলেছিল, "কই, দ্যাখ। তোরা নাকি বলছিলি আসবে না! এই তো এসেছে।"

একে-একে বাড়ির লোক বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল। সকলের চোখেমুখে বিস্মিত উচ্ছ্বাস। ওদের মধ্যে রাখি এগিয়ে এসে প্রণাম করেছিল কুশলকে। তখনই কুশলের খেয়াল পড়ে বড়মামাকে প্রণাম করা হয়নি। রাখির পর বাবলু প্রণাম করল, বড়মামা পরিচয় দিল ওদের। কুশল অবাক হয়ে লক্ষ করেছিল, সেই প্রাচীন রেওয়াজটা এখনও এবাড়িতে আছে। রাখি, বাবলু কুশলের পর বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠদেরও প্রণাম করল। বড়মামার ছেলে পল্টুও তার মধ্যে ছিল। কুশলও সেই সময় মামা-মামিদের প্রণাম সেরে নেয়। মামিরা স্নেহমিশ্রিত অভিমানে নানা কথা বলে যাচ্ছিল, "শেষমেষ তাহলে এলি", "বড়মামার শরীর খারাপ শুনেই এসেছিস। আমাদের কথা বললে আসতিস না", "এবাড়ির সঙ্গে তোর রক্তের টান, সেটা ভুলিস না", "তোর মামাদের তো একটাই বোন, তুই একমাত্র ভাগ্নে"...আরও কত মন্তব্য!

শেষমেশ বড়মামাই মামিদের থামিয়ে দেয়। "ওকে এখন ছাড়। এতটা জার্নি করে এসেছে, রেস্টফেস্ট নিক। পরে গল্প হবে।"

রাখি কুশলের ব্যাগপত্র তুলে নিয়ে বলেছিল, "চলো, তোমার ঘরটা দেখিয়ে দিই।"

ওকে অনুসরণ করার আগে বড়মামার দিকে তাকিয়েছিল কুশল, চোখ নাচিয়ে বড়মামা বলেছিল, "খাওয়াদাওয়া কর, দুপুরে রেস্ট নে। বিকেলে কথা হবে।"

কী কথা? প্রয়োজনটা নাকি তারই, এসব জানা সত্ত্বেও তেমন কৌতূহল দানা বাঁধল না কুশলের মনে। বাড়িতে ঢোকার পরই অদ্ভুত এক আলস্য জড়িয়ে ধরেছিল। তাকে একটা আলাদা ঘর দেওয়া হয়েছে, বিছানায় নতুন চাদর। জানলার পর্দাগুলোও সম্ভবত নতুন। টেবিল চেয়ার সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘরে অবশ্য বেশিক্ষণ বসেনি কুশল, ট্রেনের পোশাক ছেড়ে পাজামা, পাঞ্জাবি পরে বেরিয়ে এসেছিল। পল্টুর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে, বাড়িটা ঘুরে-ঘুরে দেখছিল। পল্টুর বিল্ডিং মেটেরিয়ালের ব্যবসা। মোটরবাইক চেপে কাজে বেরিয়ে যাওয়ার আগে কুশলকে বলেছিল, "আশপাশ ঘুরতে চাইলে বোলো। বাইকে করে ঘুরিয়ে দেব।"

কুশল হেসে বলেছিল, "আজ থাক। কাল যেতে পারি।"

পল্টু যখন বাইকে চেপে বসেছে, কুশল জানতে চেয়েছিল, "হ্যাঁ রে, আমাকে এভাবে ডেকে পাঠানোর কারণটা তুই জানিস?"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে পল্টু বলে, "আমি কিছু জানি না। বাবা তোমাকে ফোনে যা বলতে বলেছে, বলেছি।"

কুশল বুঝে যায় কারণটা বেশ গোপন। সম্ভবত কাউকেই বলেনি বড়মামা।

বাড়িটা চৌকো, একপাশে ছিল মস্ত বাগান। এখন পাঁচিল উঠে গিয়েছে, বাগান বিক্রি হয়ে গিয়েছে। মাঝের উঠোন একইরকম আছে। উঠোন ঘিরে পরপর ঘর। টিনের চাল উঠে গিয়ে এখন পুরোটাই ঢালাইয়ের ছাদ। অনেকটাই বদলে গিয়েছে বাড়িটা। ছোটবেলার সঙ্গে মিলেও যেন মিলছে না। তাই চেষ্টা করেও এখানে মাকে আর খুঁজে পেল না কুশল। বাড়ির বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে এখন আর পাহাড় দেখার উপায় নেই, দোতলা বাড়ি সামনে দাঁড়িয়ে।

কুশলের সঙ্গে রাখিও ঘুরছিল। ও বাড়ির সব খবর বলছিল। বড়মামা, মেজমামার মেয়েদের কোথায় বিয়ে হয়েছে, জামাইরা কে কী করে ইত্যাদি। মেজমামিকে নাকি এবাড়ির সবাই খুব ভয় পায়, এমনকী পল্টু পর্যন্ত। পল্টু এ পাড়ার আধা-মস্তান। কলেজ ইউনিয়নের সেক্রেটারি ছিল। এরকম নানান গল্প। কুশল রাখিকে শোনাচ্ছিল, তার ছোটবেলায় এবাড়িটা কেমন ছিল। টিনের চাল, বাঁশের বেড়া রাখি দেখেনি। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে পাকা ছাদ, পাঁচিল দেখেছে। বাগানটা অবশ্য ওর চোখের সামনেই বিক্রি হয়।

জলখাবার শেষ করে কুশল দালানেই বসে থাকে আরও কিছুক্ষণ। মনটা কেবলই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎই মনে পড়ে, আজ বাবাকে এখনও ফোন করা হয়নি। বাবা নিজেই করেনি তো? ফোনটা তো পড়ে আছে কুশলের ঘরে। গতকাল ঘরে ঢুকেই বাবাকে ফোন করেছিল কুশল।

নিজের বুদ্ধিতেই বলেছে, "বড়মামার অবস্থা খুবই খারাপ। এ রোগের চিকিৎসা হওয়ার মতো ব্যবস্থা এখানকার সরকারি হাসপাতালে নেই। খরচার ভয়ে এরা বড়মামাকে নার্সিং হোমে দিচ্ছে না। তেমন বুঝলে আমি ভাবছি অ্যাডমিট করাব।"

বাবা বলল, "অবশ্যই। তোমার অ্যাকাউন্টে টাকা কম থাকলে বোলো, আমি এখান থেকে ভরে দেব।"

"এখনই লাগবে না। দরকার হলে বলব," জানিয়ে ফোন রেখে দিয়েছিল কুশল।

বড়মামার জন্য বাবা যে এখনও কতটা উদার এবং দায়িত্ববান, এটা কুশলের চেয়ে ভাল কেউ জানে না। সেই বড়মামাই কিনা গতকাল বিকেলে কুশলের কাছে বাবার নামে যা-তা বলল! এই ধরনের কথা শোনার আগাম কোনও প্রস্তুতি ছিল না কুশলের। এদিকে বড়মামা যা বলছে, তা রীতিমতো তথ্যপ্রমাণসহ। ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিল কুশল, সেই জট এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

"তোমার চা, দাদা," বলল রাখি।

চটকা ভেঙে রাখির দিকে তাকায় কুশল। রাখি চায়ের কাপ মেঝেতে নামিয়ে বলে, "কী এত ভাবছ?"

"সেরকম কিছু না," বলে সাদাসিধেভাবে হাসে কুশল।

রাখি বলে, "আমি জানি তুমি কী নিয়ে ভাবছ। অত ভাবাভাবির কিছু নেই। গ্যারান্টি দিচ্ছি।"

ইঙ্গিতপূর্ণ হেসে সোজা হয়ে দাঁড়াল রাখি। তারপর ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলল, "এখন যাই। বাবলুকে স্কুলের ব্যাগ গুছিয়ে দিতে হবে। পরে তোমার সঙ্গে ও ব্যাপারে কথা বলব।"

রাখি যে-বিষয়টার কথা বলছে, মোটেই সেটা নিয়ে চিন্তিত নয় কুশল। ওসব এখন পাশে সরিয়ে রেখেছে। ঘুরেফিরে কেবলই বড়মামার কথাগুলো নিয়ে ভাবছে। বাবার প্রতি বড়মামার বিশ্লেষণ কতটা ঠিক?

কাল রাখির সঙ্গে বাড়ির চারপাশ ঘুরতে-ঘুরতে কুশল বলেছিল, "ছোটবেলায় বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভুটান পাহাড় দেখতাম। তুই দেখেছিস কখনও?"

"নাঃ। ছাদে গিয়েও দেখা যায় না। সামনে কত বাড়ি। তবে সেপাইমাঠ থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। যাবে? এই তো কাছেই।"

রাখি উল্লেখ করতেই সেপাইমাঠের কথা মনে পড়েছিল কুশলের। সে যেতে রাজি হয়েছিল। মাঠে গিয়ে পাহাড় অবশ্য দেখা গেল না। ধোঁয়া-ধোঁয়া হয়েছিল সামনেটা। মাঠটাকেও ছোট মনে হচ্ছিল। ফেরার পথে রাখিকে একবার প্রশ্নটা করে দেখছিল, যদি কিছু বলতে পারে। দেখা গেল রাখি অনেকটাই জানে। খবরটা জোগাড় করেছে লুকিয়ে। তাই প্রথমেই শর্ত রেখেছিল, "আমি বলেছি, তুমি কিন্তু বাড়ির কাউকে বলতে পারবে না।"

কুশল রাজি হয়েছিল শর্তে।

তখন রাখি বলে, "তোমার সঙ্গে তনুশ্রীদির সম্বন্ধ করা হচ্ছে। তনুশ্রীদিরা আমাদের পাড়াতেই থাকে।"

আকাশ থেকে পড়েছিল কুশল। সবিস্ময়ে বলেছিল, "সম্বন্ধ মানে তো বিয়ে!"

দু'হাত দু'পাশে ছড়িয়ে কপাল কুঁচকে রাখি বলে, "আজ্ঞে হ্যাঁ। তুমি কী ভাবলে, মুখেভাত?"

"না, তা বলছি না। ভাবছি, বড়মামা হঠাৎ আমার বিয়ে নিয়ে পড়ল কেন!"

"পড়বে না! সম্বন্ধ তো বড়রাই করে থাকে। তোমার অবশ্য কাউকে ঠিক করা থাকলে আলাদা কথা।"

"ঠিক করা আছে কি নেই, সেটা না জেনেই বড়মামা সম্বন্ধ করতে যাচ্ছে কেন?"

রাখি মাথা নেড়ে বলেছিল, "তা আমি বলতে পারব না বাবা। দরজা বন্ধ করে বাড়িতে বড়দের একদিন মিটিং হচ্ছিল। পল্টুদাকেও সে মিটিংয়ে রাখা হয়নি। বাড়ির বাইরের দিকে জানলার পাশে দাঁড়িয়ে আমি শুনলাম। মিথ্যে খবর দিয়ে তোমাকে এখানে ডেকে পাঠিয়ে তনুশ্রীদিকে দেখানো হবে। অনেকে অনেকরকম বলছিল, তবে বড়জেঠুর প্ল্যানটাই থাকল। পুরো ব্যাপারটা অবশ্য শুনতে পারিনি।"

কুশল মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছিল না। যে-আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ এত ক্ষীণ, সেই মামা-মামিরা তার বিয়ে নিয়ে এত উঠেপড়ে লাগল কেন! তা-ও আবার এরকম ষড়যন্ত্রের কায়দায়!

রাখি বলে যাচ্ছিল, "আজ সন্ধেবেলা আমাদের বাড়িতে আসবে তনুশ্রীদি। তোমার ট্রেনে চড়ার ফোন না পেয়ে বড়জেঠি তো কাল ওদের না করে দিতে যাচ্ছিল। বড়জেঠু মানা করল। বলল, ট্রেন আসার টাইমটা পার হতে দাও। হয়তো ভুলে গিয়েছে ফোন করতে। তোমার জন্য জেঠু স্টেশনেও যাচ্ছিল, সাইকেল বের করে দেখে, চাকায় লিক। কাল ট্রেনটাও এসেছে রাইট টাইমে।"

রাখি অনর্গল কথা বলতে পারে। কুশলের নীলার কথা মনে পড়ে যায়। ট্রেনে প্রচুর কথা বলেছে নীলা। মনখারাপ কাটানোর জন্যই হয়তো বলেছে,

PujaABP B/W F7(Page 101-116=16 Pages)

তবে জার্নিটা একেবারে জমিয়ে রেখেছিল। ওর মেসেজের উত্তরটাও দেওয়া হয়নি। আসলে ভেবেই পায়নি কী লিখবে। অত বলিয়ে-কইয়ে নয় কুশল।

"তোমার কি সত্যিই কেউ ঠিক করা আছে?" জিজ্ঞেস করেছিল রাখি।

কপট শাসনে কুশল বলেছিল, "যদি থাকেও, তোকে কেন বলব? তুই আমার থেকে কত ছোট জানিস!"

"জানি। তাতে কী হয়েছে? আমিও তো সামনের বছর কলেজে যাব।"

কুশল মজা করে জানতে চায়, "হ্যাঁ রে, তোর কেউ আছে নাকি?"

মুখ বেঁকিয়ে রাখি বলেছিল, "ধুর, এখানকার একটা ছেলেও পাতে দেওয়ার যোগ্য নয়। সবক'টাই এক নম্বরের ক্যাবলা। আমি বিয়ে করলে, শিলিগুড়ির ছেলেকে করব।"

"শিলিগুড়িতেই আটকে গেলি কেন? কলকাতার ছেলেরা তো আরও স্মার্ট।"

"ওরে বাবা, কলকাতা আমার ভীষণ ভয় করে। এত ভিড়! ওখানে শ্বশুরবাড়ি হলে, রাস্তায় বেরিয়ে বাড়ি ফিরতে পারব না।"

রাখির কথায় হেসে ফেলেছিল কুশল।

রাখি বলেছিল, "তুমি কিন্তু কথা ঘোরাচ্ছ দাদা। বলো না কাউকে কি কথা দিয়ে ফেলছ?"

"তাতে তোর সুবিধে?"

"সুবিধে নয়, ভীষণ অসুবিধে।"

"কেন?"

রাখি বলতে থাকে, "তনুশ্রীদি যা সুন্দর দেখতে না, তোমার সঙ্গে বিয়ে হলে দারুণ মানাবে। এখানে শ্বশুরবাড়ি হলে তোমাকেও আসতে হবে মাঝেমাঝে। পাশে মামাবাড়ি থাকতে তুমি তো শ্বশুরবাড়িতে এক রাতের বেশি কাটাবে না। তখন চুটিয়ে আড্ডা মারতে পারব তোমার সঙ্গে। তনুশ্রীদির ননদ বলে, পাড়ায় আমার প্রেস্টিজও বেড়ে যাবে।"

"বাবা, তুই তো অনেকদূর ভেবে ফেলেছিস দেখছি। তোর তনুশ্রীদির তো আমাকে পছন্দ না-ও হতে পারে। বলছিস, দারুণ দেখতে!"

"পছন্দ হবে না মানে! তোমার মতো হ্যান্ডসাম ছেলে ও পাবে কোথায়? দেখো, এতক্ষণে হয়তো পছন্দ হয়ে দেখা করার জন্য ছটফট করছে।"

কথাটা ধরতে পারেনি কুশল। "মানে?"

রাখি বলে, "আমরা যখন বাড়ির চারপাশে ঘুরছিলাম, কাপড় শুকোতে দেওয়ার ছল করে তনুশ্রী ওদের ছাদে উঠেছিল। দেখছিল আমাদের। যেই আমার চোখাচোখি হয়েছে, ছুটে পালিয়েছে ভিতরে।"

"এতে কীভাবে বোঝা গেল, আমাকে পছন্দ হয়েছে?"

"বোঝা যায়। কাউকে পছন্দ হলে ভাবভঙ্গি পাল্টে যায় মেয়েদের। ছেলেদের থেকে মেয়েরাই সেটা আগে ধরতে পারে।"

"তুই তো বিশাল পেকেছিস, দেখছি!" মজার সুরেই বলেছিল কুশল।

কথাটাকে গ্রাহ্য না করে রাখি চিন্তিত গলায় বলেছিল, "আমি এখন ভাবছি, তোমার আবার পছন্দ হবে তো তনুশ্রীদিকে? কলকাতায় কত সুন্দর সুন্দর মেয়ে, তাদের কারও সঙ্গে তোমার যদি প্রেম-ট্রেম থাকে, তাহলে আমার কপালে তনুশ্রীদির মতো বউদি জুটল না। তবে তাকে যদি পাকা কথা দিয়ে না থাকো, তনুশ্রীদিকেই বিয়ে করো। ভীষণ ভাল মেয়ে। সুন্দরী বলে কোনও অহঙ্কার নেই। পড়াশোনাতেও ভাল। ছেলেদের ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন। কোনও বদনাম দিতে পারবে না কেউ। খুব ভাল গান গায়..."

ফিরিস্তি আরও হয়তো চলত, বাড়ি এসে গিয়েছিল বলে থামল রাখি। ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল কুশলের। তখনও শরীরের ভিতর ট্রেনের দুলুনি চলছে। চান-খাওয়া করে ঘরে গিয়ে বিছানায় টানটান হয়েছিল।

চা নিয়ে এসে ঘুম ভাঙিয়েছিল রাখি। জানিয়েছিল, বড়জেঠু ছাদে ডাকছে।

ঘড়ি দেখেছিল কুশল, সাড়ে চারটে। ছাদে উঠে দেখা গেল আলো নিভতে এখনও অনেক দেরি আছে। নীচের ঘরে মনে হচ্ছিল, এই বুঝি সন্ধে নামল। ছাদ থেকে বীরপাড়ার অনেকটাই দেখা যায়। আশপাশের মাঠ থেকে ভেসে আসছিল খেলাধুলোর হইচই। আকাশজুড়ে পাখিদের আনাগোনা। বাসায় ফিরতে ব্যস্ত তারা।

বড়মামা বসেছিল ইজিচেয়ারে, পাশে বেতের মোড়া। সেখানে গিয়ে বসেছিল কুশল।

বিনা ভূমিকায় বড়মামা বলেছিল, "এবার তো বিয়ে করতে হবে তোকে। কিছু ভেবেছিস? তোর বাবা মেয়ে দেখছে?"

মাথা নেড়েছিল কুশল। তারপর বলেছিল, "বাবা বিয়ে করতে বলে। তবে অদ্ভুত একটা কন্ডিশন রেখেছে।"

"কীরকম?" খুবই ঢিলেঢালা কৌতূহলে জানতে চেয়েছিল বড়মামা। প্রশ্নের মধ্যে সামান্য ব্যঙ্গেরও সুর ছিল।

সজাগ হয়েছিল কুশল, এবাড়িতে কোনওভাবে বাবাকে ছোট করা চলবে না। বলেছিল, "ঠিক কন্ডিশন নয়, অনুরোধ বলতে পার। বলেছে, বিয়ে করে আমি যেন আলাদা থাকি। একটা সেটআপে এতদিন ধরে অ্যাডজাস্ট হয়ে গিয়েছে, নতুন কেউ এসে সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করুক, বাবা চায় না।"

"আমি জানতাম, শ্রীবাসদা এরকম কোনও একটা ফ্যাকড়া তুলবেই। তা তুই কী ভাবছিস?"

উত্তর দিতে সময় নিয়েছিল কুশল। বাবার ইচ্ছেটাকে 'ফ্যাকড়া' কেন বলছে মামা! আগাম আন্দাজ পেলেই বা কী করে? ব্যাপারটা বুঝতে হলে কথা চালিয়ে যেতে হবে। কুশল বলেছিল, "বাবাকে কাজের লোকের ভরসায় রেখে আমার আলাদা থাকার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। বয়স হয়েছে বাবার।"

"তাহলে কি তুই বিয়ে করবি না? অন্তত শ্রীবাস যতদিন বেঁচে আছে?" বিস্ময় বিরক্তি সমেত বলে উঠেছিল বড়মামা।

কুশল বলে, "এখনই এসব নিয়ে ভাবছি না।"

অসহিষ্ণু গলায় বড়মামা বলেছিল, "এখনই ভাব। বয়স তোরও বাড়ছে। পরে ভাল পাত্রী পাওয়া যাবে না। বাবার মৃত্যুর অপেক্ষায় নিজের বিয়েটা ঠেকিয়ে রাখা, এ কোনও কাজের কথা নয়।"

কথাটা বড্ড কর্কশ শুনিয়েছিল কুশলের কানে। তড়িঘড়ি বলে, "না না, সে কথা হচ্ছে না।"

মামা বলেছিল, "মানেটা তাই দাঁড়ায়। এবার আমি বলি, শোন। শ্রীবাসদা চায় না তুই বিয়ে করিস। বেলা মারা যাওয়ার পর তোকে এমনভাবে আগলে আগলে মানুষ করেছে, সংসারে যে একজন মেয়েমানুষের প্রয়োজন আছে, বুঝতে দিতে চায়নি। তোর মনে বিয়ের ইচ্ছেটা কোনওদিনই সেভাবে দানা বাঁধবে না। বিয়ে করে আলাদা থাকতে বলাটা শ্রীবাসদার শেষ চাল। জানে, ছেলের সঙ্গে তার যা রিলেশন, কখনওই বাবাকে ছেড়ে অন্যত্র সংসার পাতবে না।"

আকাশে আলো কমে আসছিল। বড়মামার কথার কোনও থই পাচ্ছিল না কুশল। সংশয়াকুল কণ্ঠে জানতে চেয়েছিল, "বাবা এরকম চাইছে কেন?"

"সেটা আমার কাছেও পরিষ্কার নয়। এক হতে পারে, বেলা সুইসাইড করেছিল বলে শ্রীবাসদার ভিতরে এক ধরনের ভীতি জন্মে গিয়েছে। ছেলের বিয়ে দিলে সেরকম যদি কিছু হয়! অনেকদিন পর্যন্ত আমার এরকমই ধারণা ছিল। যতবার তোর বিয়ের কথা তুলেছি, বলেছে, আমি একা মানুষ, কোথায় কী দেখব, তোমরা খোঁজখবর করো।" এতখানি বলার পর থেমেছিল বড়মামা।

তারপর বড় একটা শ্বাস ফেলে মাথা নিচু করে বলেছিল, "তিনটে সম্বন্ধ জোগাড় করেছিলাম। প্রথম পাত্রীর ছবি দেখার পর বলল, ঠিকুজি, কুষ্ঠি লাগবে। দিলাম পাঠিয়ে। পরের দুটো পাত্রীর ছবি, কুষ্ঠি একসঙ্গে পাঠিয়েছি। প্রত্যেকটা ক্যানসেল করেছে। বলেছে, কুষ্ঠি মেলেনি।"

অবিশ্বাসের গলায় কুশল বলেছিল, "বাবা কুষ্ঠি দেখতে চেয়েছে! এসব ব্যাপারে কখনও কোনও আগ্রহ দেখিনি আমি। ঠাকুরদেবতা নিয়ে মাথাই ঘামায় না।"

"সবই আমি জানি। তাও ভেবেছিলাম, স্ত্রীর অপঘাতের কথা ভেবে, ছেলের বউ নির্বাচনে সতর্ক হয়েছে। আমার ধারণাটা গুলিয়ে গেল দিন পনেরো আগে।"

"কীরকম?"

বড়মামা বলতে থাকে, "আমার মা, মানে তোর দিদিমা মারা যাওয়ার পর থেকে সেই ঘরটা বন্ধই ছিল। একদিন মনে হল, মায়ের ঘরটা পাল্টানো উচিত। স্মৃতিটা বড্ড ভারী হয়ে বসে আছে। ঘরটা পরিষ্কার করতে গিয়ে মায়ের তোরঙ্গ থেকে এমন একটা জিনিস পেলাম, শ্রীবাসদার সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটা তালগোল পাকিয়ে গেল।"

"কী পেলে?"

বড়মামা ফতুয়ার পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে বলে, "বেলার চিঠি। মারা যাওয়ার ক'দিন আগে মাকে লিখেছিল। শাড়ি চাপা দিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল মা। আমাদের দেখায়নি। পাছে আমরা শ্রীবাসদার ওপর চোটপাট করি। শ্রীবাসদার সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারে মায়েরই তো আগ্রহ ছিল বেশি।"

বড়মামা চিঠিটা এগিয়ে ধরেছিল। কুশল ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়ে। আন্দাজ করতে অসুবিধে হচ্ছিল না, চিঠির ছদ্মবেশে এটা আসলে মায়ের সুইসাইডাল নোট।

কুশল কোনওমতে উত্তর দিয়েছিল, "পরে পড়বক্ষণ। তুমি বলো না, কী লেখা আছে।"

চিঠিটা ভাঁজ করে হাতেই রাখে বড়মামা। "এটা পড়ে বোঝা যাচ্ছে, বেলা এর আগেও এরকম কিছু চিঠি লিখেছে। মায়ের সঙ্গে আলোচনা করেছে শ্রীবাসদার দুর্ব্যবহার নিয়ে। ঝগড়াঝাঁটির ভয়ে মা কোনওদিন এই ব্যাপারে আমাদের কিছু জানায়নি। বেলা যে শ্বশুরবাড়িতে চাপের মধ্যে আছে,

amarboi.com

সেটা আমি টের পেতাম। বেশ কয়েকবার ওকে জিজ্ঞেসও করেছি। এড়িয়ে গিয়েছে। শ্রীবাসদা সিরিয়াস ধরনের। ওপর থেকে দেখে, তেমনটাই মনে হত। কিন্তু এই চিঠি পড়ে আমি তো থ।"

মামার হাতে ধরে রাখা চিঠিটার কিছু অক্ষর দেখা যাচ্ছিল। মায়ের হাতের লেখা খুব কম দেখেছে কুশল। সংসারের হিসেবের পুরনো একটা খাতা এখনও আছে আলমারিতে। সেখানে মায়ের হাতের লেখায় সংখ্যাই বেশি। কুশলের ছোটবেলার গল্পের বইয়ে মা নাম লিখে দিত। সেই বইগুলো আছে। চিঠিতে উঁকি দিচ্ছে অনেক অক্ষর, কথা বলতে চাইছে মা। কথায় শুধু শব্দ নেই।

কম আলোতেই চিঠিটা খুলে পড়তে শুরু করেছিল বড়মামা, "শ্রীচরণেষু মা, আশা করি তোমরা সব ভাল আছ। এবার পুজোর ছুটিতে বোধহয় যাওয়া হবে না। যেতে দেবে না তোমার জামাই। পুজোর জামা-কাপড়ের টাকা পাঠিয়ে দেবে। একগাদা খরচা করে জামাইয়ের জামা-প্যান্ট কিনতে বারণ করো বড়দাকে। ও শ্বশুরবাড়ির কোনও জিনিস ছোঁয় না। সবচেয়ে ভাল হয় দাদা না এলে। বড়দা চলে যাওয়ার পর বড্ড কথা শোনায়। ভিখিরি বলে। অত্যাচারের সীমা ক্রমশ ছাড়িয়ে যাচ্ছে মা। এবাড়িতে যদি বিয়ে দিলেই, সঙ্গে আরও সহ্যশক্তি দিলে না কেন? আমি আর পারছি না মা। একদিন সব ছেড়েছুড়ে চলে যাব। নাতিটাকে একটু দেখো। ইতি তোমার হতভাগিনী মেয়ে, বেলা।"

চিঠি পড়া শেষ করে মুখ তুলেছিল বড়মামা। চশমার তলা দিয়ে জল গড়িয়ে এসেছে। ভাঙা গলায় বলেছিল, "একটাই বোন, বড় ভালবাসতাম রে। আমার পিছনেই ঘুরঘুর করত বেশি। সাইকেলে চাপিয়ে কত বন-জঙ্গল, নদী দেখাতে বেরোতাম।"

গোটা বিষয়টাই অবান্তর লাগছিল কুশলের। বাবা যে মায়ের উপর অত্যাচার করে, এরকম স্মৃতি তার নেই। মাকে কোনওদিন একলা কাঁদতেও দেখেনি। বাবা মা নিজেদের মধ্যে বেশি কথা বলত না, এটা মনে আছে। ছোটবেলা থেকেই বাবাকে গম্ভীর প্রকৃতির বলে জেনে এসেছে কুশল। বাইরে থেকে দেখলে, এখনও তাই। কাছে থেকে বাবার কোমল হৃদয়ের পরিচয় পেয়েছে কুশল। সকলের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে, পাড়ার লোকের বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়ায়। অর্থসাহায্যও করে। বাবাকেও পাড়ার সকলে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, পাড়ার অনেকেই এখনও কুশলকে নামে চেনে না, শ্রীবাসদার ছেলে বলেই জানে।

সেই শ্রীবাস মুখোপাধ্যায় বউকে নির্যাতন করত, এ কথা বললে, পরিচিতজনের মধ্যে সবচেয়ে কেচ্ছাখোর লোকও বিশ্বাস করবে না। এদিকে মামার হাতে মায়ের লেখা চিঠিটাকেও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর কুশল বড়মামাকে বলেছিল, "বাবা কেন অত্যাচার করত মায়ের উপর? বাবাকে আমিই সবচেয়ে কাছ থেকে দেখি, কখনওই ওরকম মানুষ বলে মনে হয় না।"

"আমারও সেটাই প্রশ্ন। কেন এত রাগ ছিল বেলার ওপর? বেলা কেমন মেয়ে ছিল, তুই এবাড়িতে এলেই বুঝতে পারিস। সবাই ওর সুখ্যাতি করে। ওরকম হাসিখুশি, ভালমানুষ মেয়ে হয় না। সে কেন শ্বশুরবাড়িতে গুম মেরে থাকবে?"

কুশল বলে, "তুমি কি জানো, তোমার শরীরখারাপের খরচ বইতে বাবা রাজি আছে। আমাকে তাই বলে রেখেছে।"

"শ্রীবাসদার এই স্বভাবটা আমি ভাল করেই জানি। এই যে চিঠিতে বেলা লিখেছে, আমাকে ভিখিরি বলে, সেটা বেলাকে কষ্ট দেওয়ার জন্যই বলত। আমার সঙ্গে কখনও খারাপ ব্যবহার করেনি তোর বাবা। বেশ কয়েকবার শ্রীবাসদার অফিসে গিয়েও দেখেছি, অতবড় কোম্পানির অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার, অথচ একেবারে মাটির মানুষ! বড় অফিসার থেকে শুরু করে বেয়ারাকে ডেকে পর্যন্ত আমার সঙ্গে আলাপ করাত। বড় সম্বন্ধী বলে পরিচয় দিত। অফিসের লোকও যে শ্রীবাসদাকে খুব পছন্দ করে, সেটাও বুঝতে পারতাম।"

"শুধু মায়ের বেলায় অন্যরকম আচরণ!"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই। সম্পর্কটা এতটাই তিক্ত ছিল যে, তোর বিয়ে দিতে ভয় পাচ্ছে শ্রীবাসদা। ঠিকুজি, কুষ্ঠি ওসব বাজে অজুহাত। স্বামী, স্ত্রী সম্পর্ক নিয়ে শ্রীবাসদা আতঙ্কে ভুগছে। এটা একমাত্র তুই-ই কাটাতে পারিস।"

"কীভাবে?"

"তোর জন্য আমি একটা মেয়ে দেখেছি। আমাদের পাড়ায় থাকে। ভদ্রবংশের মেয়ে, এমএ পাশ। দেখতেও খুব সুন্দর। সন্ধেবেলা ওরা আসবে। বাবা, মা, মেয়ে। ঠিক মেয়ে দেখানোর ব্যাপার এটা নয়, আড্ডাগল্প হবে। ফ্রি অবস্থায় একটা মেয়েকে ভাল জাজ করা যায়।"

কথার মাঝে কুশল বলে উঠেছিল, "আজ থাক না। আমাকে একটু ভাবতে দাও।"

অধৈর্য কণ্ঠে বড়মামা বলেছিল, "ভাবাভাবির আর কিছু নেই। এবার কাজে নামতে হবে। মেয়েটাকে যদি তোর পছন্দ হয়, বাবাকে গিয়ে বল, মামারা বিয়ের ঠিক করেছে। পাত্রী দেখে তুই মত দিয়েছিস।"

কুশল বড়মামাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল, "বাবার তো বিয়েতে অমত নেই। বলবে, আলাদা থাকতে। নিজেই হয়তো ফ্ল্যাট কিনে দেবে। আমার সেটাতেই আপত্তি।"

"শুনবি না বাবার কথা। বলবি, বিয়ে করে এবাড়িতেই থাকব। এই কাজটা তোর অনেক আগেই করা উচিত ছিল। বাবার ব্যাপারে তুই এতটাই অন্ধ, অযৌক্তিক আবদারটা মেনে নিয়েছিস। কোনও মেয়ের সঙ্গে যদি তোর ভাবসাব থাকত, তখন তুই কি করতিস?"

"নেই, জানছ কী করে?" অস্বস্তি হলেও, কথাটা বলেই ফেলেছিল কুশল।

বড়মামা বলল, "তোর বাবাই বলেছিল, নেই। ওর সব খবর আমি রাখি। তোমরা নিশ্চিন্তে মেয়ে দেখতে পার। এই 'সব খবর' রাখাটা যে কত খারাপ, শ্রীবাসদা বোঝে না। নিজে থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাটাই তৈরি হয়নি তোর মধ্যে।"

বড়মামা খুব একটা ভুল কিছু বলছিল না। কুশল কোনও মন্তব্য করেনি। আশপাশের বাড়ি, দূরের পাড়া থেকে শাঁখের শব্দ ভেসে আসছিল। নিজেদের বাড়ির শাঁখ বেজে উঠতেই বড়মামা কপালে হাত ঠেকিয়ে নিয়ে বলে, "দ্যাখ, শ্রীবাসদার উপর আমার রাগ হলেও, প্রতিশোধ নেওয়ার কোনও ইচ্ছে নেই। চিঠিটা হাতে না এলে, এতকিছু জানতেও পারতাম না। বেলার চলে যাওয়া অনেকদিন আগেই মেনে নিয়েছি। আমার যাবতীয় চিন্তাভাবনা তোকে নিয়ে। তোর মধ্যেই আমি বেলাকে দেখতে পাই। আমি চাই তোর সন্তান-সন্ততির মধ্যে বেলা পৃথিবীতে থেকে যাক।"

এতদূর শুনে বড়মামার সামনে থেকে উঠে পড়েছিল কুশল। একলা থাকতে চাইছিল কিছুক্ষণ। জীবনের একটা অজানা বাঁকে এসে পড়েছে, এখন পাশে বাবাকে পাবে না। ঠান্ডা মাথায় ভাবতে হবে সব কিছু। সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল কুশল।

বড়মামা বলল, "চিঠিটা নিয়ে যা।"

কুশল নেয়নি। বলেছিল, "আপাতত তোমার কাছে থাক।"

নীচে নেমে কুশল ঘরে যায়নি, চটি পরে বেরিয়ে গিয়েছিল রাস্তায়। কতটা হেঁটেছিল খেয়াল নেই। আলো-অন্ধকার রাস্তা। মার্চের শুরুতে এদিকে এখনও ঠান্ডা আছে। পড়া মুখস্থ করার আওয়াজ, গানের রেওয়াজ ভেসে আসছিল বাড়িগুলো থেকে। নিজেকে বারেবারে বোঝাচ্ছিল, অতীতকে নিয়ে এত নাড়াচাড়া করে লাভ নেই। যা ঘটে গিয়েছে তাকে ভুলে যাওয়াই ভাল। তবু ঘুরেফিরে একটা কথাই মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল, বীরপাড়ায় এসেছিলাম মায়ের প্রাণচঞ্চল চেহারাটা মনের মধ্যে গেঁথে নিতে। পাওয়া গেল দুঃখের ছাইয়ের মতো মায়ের হাতের কিছু অক্ষর। বুক ঠেলে কান্না আসছিল কুশলের। রাস্তা ক্রমশ নির্জন হচ্ছিল, দু'পাশে বড়-বড় গাছ। জোনাকি উড়ছিল অন্ধকারে। বাড়ি ফেরার রাস্তা ধরে কুশল।

কিছুদূর হেঁটে আসার পর রিকশা পেয়ে উঠে বসে। পথ চিনে বাড়ি ফিরতে বেশ বেগ পেতে হত।

বারান্দায় পা দিয়েই টের পেয়েছিল, বৈঠকখানায় অতিথি এসেছে, গল্পগুজবের আওয়াজ আসছিল। তাকে যে পাত্রী দেখানো হবে, ভুলতেই বসেছিল কুশল।

ঘরে ঢুকতেই বড়মামা বলেছিল, "কোথায় চলে গিয়েছিলি? এত দেরি হল! রাস্তাঘাট সব মনে আছে তোর?"

ঘরভর্তি লোক তখন কুশলের দিকে তাকিয়ে আছে। খুবই বিব্রত বোধ করছিল সে।

বড়মামা পরিস্থিতি সহজ করে দিয়েছিল। "যা, হাতমুখ ধুয়ে আয়। এঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই তোর।"

চোখেমুখে জল দিয়ে বৈঠকখানায় গিয়ে বসেছিল কুশল। বড়মামা আলাপ করিয়ে দিল তনুশ্রীর বাবা, মায়ের সঙ্গে। রাখি মেয়েটির সম্বন্ধে বাড়িয়ে বলেনি। ফর্সা গায়ের রং, প্রতিমার মতো সুন্দর। হলুদ, সবুজ তাঁতের শাড়ি পরে ছিল। কুশলের দিকে তাকাচ্ছিল সলজ্জ চাউনিতে। তনুশ্রীর বাবা গল্পের ছলে কুশলের চাকরি সম্বন্ধে জানলেন। তাঁর মেয়ের স্কুলে পড়ানোর শখ, সেটাও বললেন। অফিসিয়াল 'মেয়ে দেখা' নয় বলে ভণিতাতে সময় যাচ্ছিল বেশি। তনুশ্রী রবীন্দ্রনাথের গান শোনাল। খারাপ গায় না। রাখি এসে তনুশ্রীর সঙ্গে গল্প জুড়েছিল।

বড়মামি একবার প্রস্তাব দিল, "যা না রাখি, কুশল আর তনুশ্রীকে নিয়ে ছাদে গিয়ে গল্প কর। আমরা নিজেদের মতো আড্ডা মারি।"

রাখি তো একপায়ে খাড়া। কী মনে করে বাধ সেধেছিলেন তনুশ্রীর মা।

বলেছিলেন, "দরকার নেই। বাইরে বেশ ঠান্ডা।"

মেয়েকে নিয়ে যথেষ্ট অহঙ্কার আছে মহিলার। পাত্রের থেকে ইতিবাচক ইঙ্গিত না পাওয়া পর্যন্ত রাশ আলগা করবেন না। কুশলের মনোভাব বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল তনুশ্রীর মায়ের। হয়তো যে-মুগ্ধতার অভিব্যক্তি তিনি আশা করেছিলেন কুশলের থেকে, যেমনটা অন্য ছেলেদের ক্ষেত্রে দেখে অভ্যস্ত, তা পাচ্ছিলেন না।

একসময় জিজ্ঞেস করেই বসলেন, "তুমি কি কথা কম বলো? নাকি আমাদের সামনে একটু বেশি চুপচাপ?"

কুশলের হয়ে উত্তর দিয়েছিল মেজমামি। "ও ছোট থেকেই এরকম। একা-একা মানুষ হয়েছে তো।"

বলার মতো কথা খুঁজে পাচ্ছিল না কুশল, যতবার চোখ যাচ্ছিল তনুশ্রীর দিকে, অদ্ভুত একটা ভ্রম তৈরি হচ্ছিল। মেয়েটার ফর্সা গলায়, বাহুতে ফুটে উঠতে দেখছিল লাল দাগ, মারের চিহ্ন। কুশলের সঙ্গে বিয়ে হলে মেয়েটার নরম শরীরে এই ধরনের দাগ দেখা যাবে। অত্যাচারী বাবার জিন বহন করছে কুশল, সে-ও বউ পেটাবে। বাবা মায়ের উপর শারীরিক নির্যাতন করত কি না, জানে না কুশল। কিন্তু একটা বিশেষ স্মৃতি মনে পড়ে যেতে, মনে হচ্ছিল বাবা গায়ে হাত তুলত। ক্লাস থ্রি-তে পড়ার সময় কুশলের একবার হাত ভেঙে যায়। স্কুলবাসের হর্নের আওয়াজ শুনে, তড়িঘড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামছিল একা। কোনও কারণে তৈরি হতে সেদিন দেরি হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিন মা সঙ্গে থাকে, হাত ধরে বাসে তুলে দিয়ে টা-টা করে। সিঁড়িতে জুতো স্লিপ করে গেল, বিচ্ছিরিভাবে গড়িয়ে পড়েছিল নীচে। প্রচণ্ড ব্যথা লেগেছিল শরীরে। 'মা' বলে আর্তনাদ করে উঠেছিল কুশল। বাবা বাড়িতে ছিল। মা, বাবা দু'জনেই নেমে এসেছিল নীচে। বাবা খুবই বকাবকি করছিল মাকে, কেন রেডি হতে দেরি হল ওর? কেন তুমি সঙ্গে করে নীচে নামালে না... এইসময় এ ধরনের তিরস্কার অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। মা গ্রাহ্য না করে বাবাকে গাড়ি বের করতে বলেছিল। কুশলকে ভর্তি করানো হল নার্সিং হোমে। বাঁ হাতের হাড় খুব খারাপভাবে ভেঙেছিল। নার্সিং হোমে থাকতে হয়েছিল কুশলকে। প্রথম রাতে মা ছিল বিছানার পাশে। দ্বিতীয়দিন কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিল না। কুশল মাকে ছাড়া থাকতে চায়নি। কাঁদত, বায়না করত। সেই সময় একটা অদ্ভুত ঘটনা লক্ষ করে, যা এখন খুবই অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে।

মা নিজের বাঁ হাত দেখাচ্ছে, কনুইয়ের নীচে রক্তজমা দাগ, কিছু জায়গায় ছড়ে গিয়েছে। মা বলছে, "এই দ্যাখ, ভগবান কেমন শাস্তি দিয়েছে আমাকেও। তোকে লক্ষ রাখিনি। আমারও তো ব্যথা হচ্ছে।"

শাস্তিটা কি বাবা দিয়েছিল? ভগবান তো এত হিসেবি নয় যে, বাঁ হাতটাই বেছে নেবে!

এইসব ভাবনা মাথায় চলতে থাকলে কি কোনও আড্ডায় সুর মেলানো যায়? তনুশ্রীরা যতক্ষণ ছিল, সত্যিই খুব কম কথা বলেছে কুশল। তনুশ্রীর বাবার বিষয়ী খোঁজখবর নেওয়াটাও তার ভাল লাগছিল না।

ভদ্রলোক জানতে চেয়েছিলেন, কুঁদঘাটের বাড়িটা বাবা পৈতৃকসূত্রে পেয়েছে, নাকি নিজের করা? যখন শুনলেন ঠাকুর্দার তৈরি, সঙ্গে-সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, কুশলের কোনও কাকা বা পিসি আছে কিনা। অর্থাৎ বাড়ির ভাগিদার ক'জন? ক'কাঠার ওপর, ক'তলা বাড়ি সবই জানলেন। বড়মামা নিশ্চয়ই ডিটেলে বলেছে, তবু একবার মিলিয়ে নিলেন। এ তো সেই ছেলে দেখতে আসাই হল। নতুন বলতে মেয়েও এসেছে। বাবার ওইসব প্রশ্নের সময় মেয়ের অস্বস্তিটাও টের পাচ্ছিল কুশল। সবচেয়ে অপ্রতিভ অবস্থায় পড়েছিল বড়মামা। জানে, বিয়ে পাকা করতে হলে অনেক বাধা পেরোতে হবে। ছেলে, মেয়ে পরস্পরকে পছন্দ করছে কি না, সেটা জেনে নেওয়ার জন্যই এই সৌজন্য সাক্ষাৎ। যে-ছেলে এখনও বিয়ের ব্যাপারে ভেবেই উঠতে পারেনি, তাকে বেশি কেজো প্রশ্ন করলে বেঁকে বসতে পারে। তেমনটা কিন্তু হয়নি কুশলের। তনুশ্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎপর্বটা কোনও ছাপ ফেলতে পারেনি মনে।

নিজের বাবাকে এতদিন সে আদর্শ বলেই মনে করত। সেই ধারণাটা এখন ভাঙতে বসেছে। এই সময় তাকে কোন মেয়ের বাবা কী প্রশ্ন করল, কিছুই এসে যায় না কুশলের। সে বারেবারে ফিরে যাচ্ছিল কিশোরবেলায়, যখন বাবা মা দু'জনেই পাশে ছিল। মনে করার চেষ্টা করছে সেই সময়ের সুখ-দুঃখের মুহূর্ত। অনেক কিছুই মনে পড়ছে, কিন্তু বাবা মাকে পাশাপাশি খুব একটা বেশি মনে পড়ছে না। দু'জনে যে খুব ঝগড়া করছে, সেই স্মৃতিও নেই। মামার কি কোথাও ভুল হচ্ছে? তবে মা কেন ওই ধরনের চিঠি লিখতে যাবে? বাবার উপর তেমন রাগ থাকলে, নিজের মাথার কাছে একটা নোট রেখে যেতে পারত। আজীবনের জন্য শাস্তি পেত অত্যাচারী স্বামী। এমন নয় তো যে, মা লিখেছিল, কিন্তু বাবাই সরিয়ে দিয়েছে কোথাও?

এরকম নানা ভাবনা নিয়ে রাতে খেতে বসেছিল কুশল। এখনও মামাবাড়িতে দালানে সারিবদ্ধভাবে খেতে বসা হয়।

বড়মামি হাতায় করে ডাল দিতে-দিতে জিজ্ঞেস করেছিল, "কেমন লাগল মেয়েটাকে?"

কথাটা ধরতে একটু সময় নিয়েছিল কুশল। বলেছিল, "জানি না।"

সারিতে বসে থাকা অন্তত চারজন 'জানি না' কথাটা বিস্ময়ের সঙ্গে উচ্চারণ করে। নিজের ভুলটা সামলে নিতে কুশল বলেছিল, "আমাকে একটু ভাবতে হবে।"

আরও অনেক কথা বলছিল মামা-মামিরা, কিন্তু কোনও কথাতেই তেমন মন দিতে পারছিল না কুশল। সে মামিদের খাবার এগিয়ে দেওয়া শাঁখাপলা পরা হাতগুলো দেখছিল। কতদিন কোনও মহিলা তাকে খাবার বেড়ে দেয়নি! মামিদের হাতগুলোর মধ্যে মনে হচ্ছিল মায়ের হাতও আছে। মাথা তুলে তাই মামিদের মুখ দেখছিল না।

রাতে মাকে নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখল। পুরনো স্বপ্ন। মা চলে যাওয়ার পর প্রায়ই দেখত। কিশোর বয়সের কুশল। মা মারা গিয়েছে কয়েক মাস হল। কুঁদঘাট বাজার থেকে থলে হাতে বাজার করে ফিরছে কুশল। বাস্তবে এ ঘটনা কোনওদিনই ঘটেনি। ছোটবেলায় তো কোনও প্রশ্নই নেই, বড় হয়েও কদাচিৎ বাজারে গিয়েছে কুশল। সে যাই হোক, বাজার করে ফেরার পথে মায়ের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। কুশল তো অবাক! বলে ওঠে, "এ কী মা, তুমি!"

মা তাড়াতাড়ি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, "চুপ চুপ।"

"তুমি বেঁচে আছ?"

"হ্যাঁ, কাউকে বলিস না।"

"তুমি বাড়ি যাবে না?"

"না।"

"কেন, মা?"

"আমি এখন অন্য একটা বাড়িতে আছি। সেখানে একটা সংসার আছে। তোর বোন নেই, তুই দুঃখ করতিস। আমার এখনকার সংসারে দুটো মেয়ে। তোর ছোট-ছোট দুটো বোন। ও-বাড়িতে তোর বাবা যেমন প্যান্ট-শার্ট পরে অফিসে যায়, তেমনই এ-বাড়িতে তোর অন্য বাবা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে। সরকারি কেরানি।"

স্বপ্নে কিশোর কুশল রেগে গিয়ে বলে, "ও-বাড়ির কেউ আমার নয়। তুমি কেন আমাদের ফেলে ও-বাড়ি গিয়েছ? ওরা তোমার কে হয়?"

মা বলল, "একদিন ও-বাড়ি ছেড়ে তোদের বাড়ি চলে এসেছিলাম। তখন ওরা খুব কষ্টে ছিল। এখন ফিরে গিয়েছি, অনেকদিন বাদে ওরা হাসছে, আনন্দে আছে। এখনই ফেরা যায় না।"

মায়ের দিকে আর তাকায় না কুশল। বাজার হাতে বড়-বড় পা ফেলে এগিয়ে গেল বাড়ির দিকে। তার ভীষণ কান্না পেল। মায়ের ব্যাপারটা কাউকে বলা যাবে না। সবাই মাকে খারাপ বলবে। লোকে যখন জানে মা মরে গিয়েছে, সেটাই জানুক।

এত বছর বাদেও ছোটবেলার মতোই বুকে পাথর চাপা অবস্থায় আজ ঘুম ভাঙল কুশলের। অভিমানের পাথরটা নামিয়ে বিছানায় উঠে বসেছিল কুশল। এই স্বপ্নের কথা কোনওদিনই সে কাউকে বলতে পারেনি। ছোটবেলায় বারবার দেখত।

মায়ের মৃত্যুটা স্বাভাবিক ছিল না, কুশল জানতে পারে ঘটনার দু'বছর পর। বাবা নিজেই বলেছিল। মৃত্যুর আগে মা শয্যাশায়ী ছিল সর্দিজ্বরে। ওই অবস্থাতেই একদিন একসঙ্গে অনেক ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে নেয়। সেই সময় একটানা কলকাতায় ক'দিন বৃষ্টি হচ্ছিল। বাবা ঘটনাটা চাপা দেওয়ার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেনি। ডাক্তারের নির্দেশমতো পুলিশ ডেকেছিল। মামাবাড়িতেও খবর দেয়। পাড়ার বিশিষ্ট মানুষজন বাবার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। মামাবাড়ি থেকে এসেছিল বড়মামা আর দাদু। বাবাকে দায়ী করার মতো কোনও প্রমাণ তাদের হাতে ছিল না। ঘটনার আকস্মিকতায় তখন তারা দিশেহারা। ব্যাপারটা নিয়ে একেবারেই হইচই হয়নি। বড়রা মিলে বসে ঠিক করে, বাবার সম্মান রক্ষার্থে ঘটনাটা লোকমুখে ছড়াতে দেওয়া যাবে না। লোকজনকে বলতে হবে হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছে মা। পাড়ার সেইসব মানুষ কথা রেখেছিলেন। কুশলকে আজ পর্যন্ত পাড়ার কারও কাছে শুনতে হয়নি, মা সুইসাইড করেছিল। মামার ছেলেমেয়েরাও সম্ভবত জানে না বিষয়টা। হার্ট অ্যাটাকের মিথ্যেটাই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। মায়ের কথা উঠলে কুশল এখনও লোকজনকে তাই বলে।

ক্লাস এইটে কুশল যখন সত্যিটা শুনল, বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "কেন আত্মহত্যা করেছিল মা?"

বাবা বলেছিল, "তোমার মায়ের মনখারাপের রোগ ছিল। খুব খারাপ রোগ সেটা। বাঁচার ইচ্ছে চলে যায়। তবে তুমি কাউকে একথা বলতে যেও না। মনখারাপের রোগকে লোকে পাগল হয়ে যাওয়া বলে। মা পাগল ছিল,

amarboi.com

সেটা শুনতে নিশ্চয়ই তোমার ভাল লাগবে না।"

এরপর থেকেই কুশল 'মনখারাপ' ব্যাপারটাকে ভীষণ ভয় পেতে শুরু করে। রোগটা যখন মায়ের ছিল, তারও হতে পারে। কিছু ব্যধি যে বংশানুক্রমে ছড়ায়, ততদিনে জানতে শুরু করেছে কুশল। মনখারাপের চান্স আছে, এমন কোনও ব্যাপারে সে জড়াত না। কারও সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব করতে যায়নি, বিচ্ছেদের কষ্ট সহ্য করতে হবে না। কোনও ধরনের তর্ক-বিতর্কের মধ্যে ঢোকেনি, পাছে হেরে গেলে মনখারাপ হয়। রাস্তার কোনও অ্যাকসিডেন্ট দৌড়ে দেখতে যায়নি, যদি বিষাদে ভরে যায় মন। খবরের কাগজ খুঁটিয়ে পড়ে না। ওতে বেশির ভাগ দুঃখকষ্টের কথাই লেখা থাকে। নিজেকে নিজেই মনখারাপ থেকে আগলে রেখেছে কুশল। প্রেম হয়নি সেই কারণেই, আঘাত আসার ভয়ে। একটা ভেসে থাকা আত্মমগ্ন জীবন বেছে নিয়েছে কুশল। তার কোনও শত্রু নেই। অত্যন্ত বদলোকের সঙ্গেও সে হেসে কথা বলে। কুশলের 'গুডবয়' ইমেজ তাই সর্বত্র। একমাত্র বাবার বেলায় কুশল বেশ দুর্বল, মানুষটা যে-বয়সে বিপত্নীক হয়েছে, অনায়াসে আর-একটা বিয়ে করতে পারত। কুশলের জন্য করেনি। সৎ মা যদি কষ্ট দেয় কুশলকে! নিজের সমস্ত মনোযোগ ছেলেকে ঘিরেই। মায়ের অভাব টের পেতে দেয়নি। গতকাল পর্যন্ত মায়ের ওভাবে চলে যাওয়াটাকে স্বার্থপরতাই ভেবে এসেছে কুশল। কিন্তু বড়মামা যে-চিঠি দেখাল, সেটা এখন অন্যভাবে ভাবাচ্ছে কুশলকে। কুশল দেখেছে, মা এখানে এলেই পাল্টে যেত, সারাক্ষণ ছোটাছুটি, হইচই, হাসি। কুঁদঘাটের বাড়িতে কেন মা এত থম মেরে থাকত? দিদিমাকে লেখা চিঠিতে মা কোন ধরনের অত্যাচারের কথা বলছে? এই সমস্ত উত্তর কুশলকে পেতে হবে। মায়ের অসময়ে চলে যাওয়ার কারণেই কুশল স্বাভাবিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আপন বলতে তার কেউ নেই। গতকাল থেকে বাবাও পর হয়ে গেল।

"কী ব্যাপার গো, তুমি তো একেবারে ধ্যানে বসে গেলে?" বলল রাখি।

কুশল রাখির দিকে তাকিয়ে অলস হাসি হাসে। মেয়েটার মধ্যে বেশ একটা প্রাণ আছে। কত কাজ করছে সংসারের!

রাখি ফের বলে, "গায়ে যে রোদ্দুর এসে পড়েছে, সে খেয়াল আছে? ভিতরে গিয়ে বোসো।"

কুশল বারান্দা থেকে উঠে দাঁড়ায়। রাখিকে বলে, "তোর স্কুল নেই?"

জলখাবারের থালা-বাসন তুলতে-তুলতে সে বলে, "আমার তো এবার হায়ার সেকেন্ডারি। টেস্ট হয়ে গিয়েছে। আর ক্লাস করতে হয় না।"

"মন দিয়ে পড়াশোনা করছিস তো?" দাদাদের এরকম বলতে হয় বলেই বলে কুশল।

ফাঁকিটা বোধহয় ধরে ফেলল রাখি। বলল, "কোন স্ট্রিম নিয়ে পড়ি, সেটাই তো এখনও জিজ্ঞেস করোনি।"

"জানি তো। আর্ট্স।"

কুশলের আন্দাজ খুব শক্তিশালী। এখানে ফেল করল। রাখি বলে, "না স্যার। সাইন্স। ক্লাসে ফার্স্ট হই আমি।"

"তাই! তাহলে তো তোকে একটা কিছু গিফ্ট দিতে হয়।"

খুবই খুশি হয় রাখি। বলে, "কী দেবে?"

"চ, বিকেলে বীরপাড়া বাজারে যাই। বাড়ির সকলের জন্য কাপড়-জামা কিনব। তাতে তুইও আছিস। এছাড়াও তোর স্পেশ্যাল কিছু হবে।"

হাসি উছলে পড়ছে রাখির মুখে। চাপাগলায় বলে, "তনুশ্রীদিকে বলব যেতে?"

"না।"

কিছু মানুষ থাকে যাকে দেখলে বসুধার মনে এক ধরনের বির্কষণ তৈরি হয়। আবার সেই মানুষটিই অন্য কারও কাছে হয়তো অত্যন্ত আকর্ষক। এর রসায়নটা জানতে বড় ইচ্ছে হয় বসুধার।

যাকে কেন্দ্র করে বিষয়টা নতুন করে মাথায় এল, সে হচ্ছে রত্নার কলিগ সুপ্রকাশ হাজরা। কলেজের নন-টিচিং স্টাফ। ভদ্রলোক এখন চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে চা-বানানোর তদারকি করছে। স্পেশ্যাল চা করতে বলা হয়েছে দোকানিকে।

সুপ্রকাশ সেই থেকে ধমকে যাচ্ছে, "কতদিন মাজো না সসপ্যান? ছাকনির কী অবস্থা? চা-পাতার কোয়ালিটি ভাল তো?"

হাইরোডের পাশে চালাঘরের চা-দোকানে কতরকম বায়নাক্কা! স্পেশ্যাল বলে হয়তো রেগুলার চায়ের থেকে প্রতি কাপ একটাকা বেশি দেবে। তাতেই যেন দোকানটা কিনে নিয়েছে!

প্রথম দেখাতেই লোকটার প্রতি একটা বিকর্ষণ তৈরি হয়েছিল, এইসব কাণ্ড দেখে বসুধার আরও বিরক্ত লাগছে।

চায়ের দোকান থেকে খানিক তফাতে প্লাস্টিক চেয়ারে বসেছে বসুধা, সামনে ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে সাঁ-সাঁ করে ছুটে যাচ্ছে গাড়ি।

বসুধার ভাড়া করা সাদা অ্যামবাসাডর দাঁড় করানো আছে একটু দূরে। ড্রাইভারকে এখন দেখা যাচ্ছে না। বসুধার পিছনে পাতলা জঙ্গল, রাস্তার ওপারে বিস্তীর্ণ সবুজ চা-বাগান। দুপুর এগারোটা, রোদে কিন্তু একেবারে তেজ নেই। হাওয়াও থমকে আছে।

বসুধা যাচ্ছে মাদারিহাট। লোকজনকে জিজ্ঞেস করে লোহানিপাড়ায় পৌঁছতে হবে, খুঁজতে হবে শোভাদের বাড়ি। কতটা সময় লাগবে বসুধা জানে না, এখনই তো অনেক বেলা হয়ে গেল। আরও প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার রাস্তা বাকি। তারপর খোঁজাখুঁজি আছে। সবে রাজাভাতখাওয়া ছেড়ে এসেছে বসুধারা। আরও সকালে বেরনো উচিত ছিল, দেরি হল সুপ্রকাশের জন্য। সকালে বউ কাজে না যাওয়া পর্যন্ত সে নাকি বেরোয় না। সংসারে অনেক কাজ থাকে।

এইসব হ্যাপা শুনে বসুধা রত্নাকে বলেছিল, "তুই অন্য কাউকে দ্যাখ।"

রত্না বলে, "ওর চেয়ে বিশ্বাসী লোক আমার এখানে চেনা নেই। তোকে তো যার-তার হাতে ছাড়তে পারি না। সুপ্রকাশ উত্তরবঙ্গের ছেলে, রাস্তাঘাট ভাল চেনে।"

কাল রত্নার কাছে এসে ওর পায়ে প্লাস্টার দেখে খুবই হতাশ হয়ে পড়েছিল বসুধা।

রত্নাকে বলেছিল, "ইস, আমার এখানে আসাটা পুরো জলে গেল। ভেবেছিলাম তোকে নিয়ে একটা জায়গায় যাব। বিশেষ দরকার।"

রত্না আশ্বাস দেয়, "সে সব নিয়ে তোকে ভাবতে না। ব্যবস্থা যা করার আমি করছি। তোর এখানে আসতে চাওয়ার ফোন আমি পা ভাঙা অবস্থাতেই ধরে ছিলাম। যদি না আসিস, সেই জন্য কিছু বলিনি। এখন চানটান করে নে, খাবার রেডি।"

বাথরুমে হ্যাঙারে ছেলেদের পাজামা দেখে বেশ চমকে গিয়েছিল বসুধা। স্নান সেরে বেরিয়ে রত্নাকে বলেছিল, "হ্যাঁ রে, তুই বাড়িতে জেন্ট্স পাজামা পরিস? বাথরুমে দেখলাম একটা।"

"ওটা সুপ্রকাশের।"

"সেটা আবার কে?"

ধীরে-ধীরে পরিচয় দিয়েছিল রত্না। সুপ্রকাশ ওর কলেজের অফিস স্টাফ হলেও প্রিন্সিপালের উপর বিরাট প্রভাব। রত্না এখানে জয়েন করার পর সুপ্রকাশ ওকে নানাভাবে সাহায্য করে। ভাড়াবাড়ি জোগাড় করে দেওয়া থেকে শুরু করে খাট-আলমারি কিনে দেওয়া পর্যন্ত। গোড়ার একমাস হোটেলে থেকে কলেজ করেছে রত্না। শিক্ষকরা চোরাগোপ্তাভাবে বিভিন্ন সমস্যায় ফেলার চেষ্টা করেছে, ইউনিয়নের ছেলেদের দিয়ে ক্লাসে তৈরি করেছে বিশৃঙ্খল পরিবেশ। তখন এক-একসময় চাকরি ছেড়ে বাড়ি ফেরার কথাও ভেবেছে রত্না। সুপ্রকাশ তাকে সমানে সাপোর্ট দিয়ে গিয়েছে। এখন পরিস্থিতি একেবারে স্বাভাবিক।

বসুধা জিজ্ঞেস করেছিল, "স্বাভাবিক তো বুঝলাম। পা-টা ভাঙলি কী করে?"

"সে-ও এক কাণ্ড। নিজের কলেজ ক্যাম্পাসেই একটা স্টুডেন্ট বাইকে ধাক্কা মেরেছিল।"

"সে কী রে, ইচ্ছে করে?"

"ইচ্ছে করে নয়। তবে এখানকার ছেলেগুলো ভীষণ বেপরোয়া বাইক চালায়, ক্যাম্পাসেও ঢুকে পড়ে। বাইকটা স্কিড করে আমার ঘাড়ে এসে পড়ল। আমার জ্ঞান ফিরল নার্সিং হোমে। সমস্ত ব্যবস্থা সুপ্রকাশ করেছে। ব্যাপারটা আর বেশি দূর গড়ায়নি।"

বসুধা জানতে চেয়েছিল, "বাড়িতে তোর দেখাশোনা করছে কে?"

"প্রথমদিকে তো বিছানা থেকে নামতে পারছিলাম না। সব সময়ের আয়া ঠিক করে দিয়েছিল সুপ্রকাশ। নিজেও ঘণ্টায়-ঘণ্টায় খোঁজ নিত। এখন মোটামুটি নিজের কাজগুলো পারি। ঘর মোছা বাসন মাজার লোক ছিলই, একটা রান্নার দিদি রেখেছি। সুপ্রকাশই দেখে দিয়েছে।"

রত্নার কথা শেষ হতে বসুধা বলেছিল, "তাহলে দেখলি তো, একা থাকা কত কঠিন। বিশেষ করে একজন পুরুষের উপর নির্ভর করতেই হয়। খুব তো বলতিস বিয়ে করব না, একা থেকে চাকরি করব। এখন তোর বাথরুমে ছেলেদের পাজামা পাওয়া যাচ্ছে। কেস সুবিধের নয়, কবে বিয়ে করছিস সুপ্রকাশকে?"

কথাবার্তা চলছিল দুপুরে ভাত খেতে বসে। বসুধার খোঁচায় প্রত্যাশা মতো কোনও লজ্জাভাব দেখা গেল না রত্নার চেহারায়। বলেছিল, "না না, ব্যাপারটা সেরকম কিছু নয়। সুপ্রকাশ আমার ভাল বন্ধু। তাছাড়া ও বিবাহিত, একটি করে ছেলেমেয়ে।"

তথ্যটা জেনে ভাল মতোই হোঁচট খেয়েছিল বসুধা, সম্পর্কটা যথেষ্ট গড়বড়ের বলেই মনে হচ্ছিল। হোঁচটটা রত্নাকে বুঝতে না দিয়ে নির্বিকার গলায় বসুধা জিজ্ঞেস করে, "তা বন্ধুটি আদর-টাদর করে? চুমুটুমু খায়?"

"ইয়ার্কি মারিস না," বলে এড়িয়ে গিয়েছিল রত্না।

দুপুরে বিছানায় শুয়ে দুই বন্ধু মিলে অনেক গল্প হল। বসুধা কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে, জানাল।

রত্না বলল, "তুই মরীচিকার পিছনে দৌড়োচ্ছিস। মেয়েটার হদিশ তো পাবিই না, গ্রামটা খুঁজে পাওয়াও দুস্কর। ডুয়ার্সে বন-জঙ্গলের মধ্যে অজস্র ছোট-ছোট গ্রাম আছে। সরকারি কাগজেও হয়তো সব গ্রামের নাম পাওয়া যাবে না। আবার এমন কিছু নাম পাবি, যার কোনও অস্তিত্ব নেই। হয়তো কোনও একসময় গ্রামটা ছিল। দারিদ্রের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে বাসিন্দারা অন্য কোথাও চলে গিয়েছে।"

"তবু আমি যাব," গোঁ ধরে বলেছিল বসুধা।

রত্না বলেছিল, "ঠিক আছে, যাস। সুপ্রকাশ আসুক, ওর সঙ্গে কথা বলি।"

কলেজ সেরে সন্ধের মুখে এসেছিল সুপ্রকাশ। লম্বা-চওড়া চেহারা, গায়ের রং ফর্সার দিকে। পোশাক থেকে শুরু করে আচরণ, সব কিছুর মধ্যেই একটা উদ্ধত ভাব।

ঘরে ঢুকেই বলেছিল, "এই তো ম্যাডাম। ট্রেনে কোনও অসুবিধে হয়নি তো?"

এমনভাবে কথা বলছিল, ট্রেনটা যেন ওরই পাঠানো। এই ধরনের লোককে কী করে যে স্ট্যান্ড করে রত্না, তা ও-ই জানে।

দু'-চারটে কথা বলার পরই লোকটা রান্নাঘরে গিয়ে চা করে নিয়ে এল। একটু ধমকানোও হল রত্নাকে, "এই জন্যই বলি, কাজের লোককে মাথায় তুলো না। সিঙ্কে এঁটো বাসন এখনও ডাঁই হয়ে পড়ে আছে। বিন্দুদির দেখা নেই। দ্যাখো হয়তো ডুব মেরে দিল। জানে বাড়িতে লোক আসবে। কোনও কাণ্ডজ্ঞান যদি থাকে!"

"দাঁড়াও না। এখনও তো সময় আছে।"

কথোপকথন শুনে বসুধা তো থ। কে যে বাড়ির মালিক, বোঝাই যাচ্ছিল না। নানা কথার পর রত্না মাদারিহাট যাওয়ার প্রসঙ্গটা তুলল।

সুপ্রকাশকে বলল, "তুমি কাল কলেজটা ডুব দাও। বসুধাকে নিয়ে যাও মাদারিহাটে। আর ওখন থেকেই খোঁজ নাও লোহানিপাড়া নামে কোনও গ্রাম আছে কি না।"

পকেট থেকে ফোন বের করে সুইচ টিপতে থাকে সুপ্রকাশ। বেশ কয়েকজনকে ফোন করেও লোহানিপাড়ার খোঁজ পেল না। গ্রামটায় যেতে চাওয়ার আসল কারণ সুপ্রকাশ জানে না। বসুধা বলতে বারণ করেছে রত্নাকে। সুপ্রকাশ জানে, শোভা বসুধার বাড়িতে কাজ করত। একটা ভুল বোঝাবুঝির ফলে রাগ করে শোভা দেশে চলে এসেছে। বসুধা ফেরত নিয়ে যেতে চায়।

ফোনে গ্রামের খোঁজ না পেয়েও হাল ছাড়েনি সুপ্রকাশ। বলেছিল, "চিন্তা করার কিছু নেই। কাল সাড়ে দশটায় রেডি থাকবেন। সারাদিনের জন্য একটা গাড়ি ভাড়া করে চলে আসব আমি।"

বসুধা বলেছিল, "আরও একটু সকাল-সকাল বেরোলে হয় না? অনেকটাই তো পথ। তারপর গ্রামটাকে খুঁজে পেতে হবে। দিনের আলো থাকতেই সারতে হবে কাজটা।"

সুপ্রকাশের হয়ে উত্তর দিয়েছিল রত্না। "খুব দূরে না রে, বড়জোর দেড় দু'-ঘণ্টার পথ। তাছাড়া এর চেয়ে তাড়াতাড়ি বেরনো সুপ্রকাশের পক্ষে সম্ভব নয়। বউ সকালে ডিউটিতে বেরিয়ে যায়। ছেলেমেয়েকে ও-ই রেডি করে স্কুলের জন্য। তারপর কলেজে আসে।"

বসুধা তখন আর কিছু বলেনি, সন্ধের পর সুপ্রকাশ বাড়ি চলে যাওয়ার পর রত্নাকে বলেছিল, "আমার সঙ্গে অন্য কেউ যাক না!"

কিন্তু সুপ্রকাশের উপর রত্নার অগাধ আস্থা। তবে রত্না বসুধাকে নিরস্ত করতে চাইছিল। বুঝিয়েছিল, শোভাকে খুঁজতে যাওয়া বৃথা। আর শোভার জন্যই সে ভুলতে পারবে না অনুপমকেও, যেটা কোনওভাবেই কাম্য নয়।

বসুধার যুক্তি আর আবেগের কাছে অবশ্য রত্না হার মানতে বাধ্য হয়।

এত কথার মধ্যে ভুলেও বসুধা নিজের আর-একটা আমির কথা বলেনি। বসুধা যে 'নীলা'ও হয়ে গিয়েছে, সেটা আর জানায়নি রত্নাকে। ট্রেনের গল্পও কিছু করেনি। নীলা নিজের মতো থাক।

রাতে দুই বন্ধু পাশাপাশি শুয়ে কলেজবেলার অনেক গল্প করল। মজার ঘটনাই মনে পড়ছিল বেশি। কে যে আগে ঘুমিয়েছিল, কে জানে।

বসুধা উঠেছিল প্রথমে। এখানে এখনও অল্প শীত আছে। রাতে পাতলা চাদর দিতে হয়েছিল গায়ে। সেটা গায়ে জড়িয়েই ঘুমন্ত রত্নার পাশ থেকে উঠে বসুধা গিয়েছিল সামনের গ্রিলঘেরা বারান্দায়। বাড়িঘর, রাস্তায় কুয়াশামাখা আলো। রত্নাদের বাউন্ডারির ভিতরে এক চিলতে বাগানে গাছে জল দিচ্ছিলেন এক ভদ্রলোক। বয়স ষাটের কাছাকাছি, পরনে ট্র্যাকসুট, মাথায় টুপি। বসুধাকে দেখে 'গুড মর্নিং' বললেন। হেসে প্রত্যুত্তর দিয়েছিল বসুধা। ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন। না দিলেও চলত, বসুধা আন্দাজ করেছিল, উনিই বাড়ির মালিক কর্নেল মজুমদার।

ভদ্রলোক রসিকতা করে বললেন, "কলকাতার লোক তো এত ভোরে ওঠে না!"

বসুধা বলেছিল, "কলকাতায় এত সুন্দর ভোর হয় না যে! তবে অনেকেই কিন্তু মর্নিং ওয়াকে বেরোয়।"

"সে তো রোগের ঠেলায়, ভোর অবশ্য হসপিটাল থেকে হিমালয়, সব জায়গাতেই সুন্দর," বলে ফের গাছগুলোকে স্নান করাতে লেগেছিলেন কর্নেল মজুমদার।

তারপর মাথা না ঘুরিয়ে বললেন, "আলাপটা গতকালই হতে পারত। জানতাম আপনি আসবেন। সময় পেলাম না। আমার স্ত্রীর আবার আর্থ্রাইটিস। সিঁড়ি ভাঙতে পারে না। কাল উপর থেকে আপনাকে দেখেছে, তারপর থেকেই আলাপ করার জন্য উদগ্রীব। আসলে বুড়োর সঙ্গে কথা বলে-বলে বোর হয়ে গিয়েছে গিন্নি। আগে তবু রত্না দিনে একবার করে যেত, এখন তো সে-ও পারছে না।"

বসুধার ভাল লেগেছিল ভদ্রলোকের আন্তরিক ব্যবহার। এরকম মানুষ দিন দিন কমে আসছে।

বারান্দায় কিছুক্ষণ কাটিয়ে বসুধা চা করে রত্নাকে ঘুম থেকে তোলে। কাপ না ধরে রত্না ঢুলুঢুলু চোখে দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরেছিল বসুধার।

বসুধার গালে চুমু খেয়ে বলেছিল, "সো সুইট অফ ইউ। লাস্ট কবে আমাকে ঘুম থেকে তুলে কেউ চা দিয়েছে, মনে নেই।"

চা খেতে-খেতে রত্না কর্নেল মজুমদারের আরও পরিচয় দেয়। ওঁদের এক ছেলে। ইঞ্জিনিয়ার। কাছেই বরদাবাড়ির এক প্ল্যান্টে চাকরি করে। বউ নিয়ে ওখানেই থাকে। আধ ঘণ্টারও পথ নয়। মাসে এক দু'বারও বাড়ি আসে কি না সন্দেহ। মজুমদারকাকু ছেলের গ্যারাজ পরিষ্কার করেন দু'দিন অন্তর। ছেলে গাড়ি কেনার সঙ্গে-সঙ্গে বাড়িতে গ্যারাজ বানিয়েছেন।

শুনতে-শুনতে বসুধার মনে হচ্ছিল, পরিবার ভেঙে যাওয়ার রোগ বড় শহর থেকে ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। এ-বাড়িতে তো জায়গার অভাব নেই। তবু মানুষ নিজের গণ্ডিটাকে ছোট করে ফেলছে।

"ম্যাডাম, চা।"

সুপ্রকাশের ডাকে বসুধা বর্তমানে ফিরে আসে। চা নিজে হাতে করে নিয়ে আসেনি, দোকানের একটা বাচ্চা ছেলে অ্যালুমিনিয়ামের থালায় বড় মাটির ভাঁড় নিয়ে এসেছে। সুপ্রকাশের সম্মানজ্ঞান বেশ টনটনে। অথচ একটা মেকি ভদ্রতা করে যাচ্ছে।

সুপ্রকাশকে একটু অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলতে বসুধা বলে, "আপনি কাল থেকে আমায় 'ম্যাডাম, ম্যাডাম' করে যাচ্ছেন কেন বলুন তো? রত্নাকে তো নাম ধরে ডাকেন। আমি তো ওর বন্ধু।"

সুপ্রকাশ গদগদভাবে বলে, "আসলে প্রথম আলাপ তো, একটু অস্বস্তি হয় নাম ধরে ডাকতে। পরে ঠিক হয়ে যাবে।"

সুপ্রকাশের থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দেয় বসুধা। লোকটা বসুধাকে ঠিক বিশ্বাস করছে না।

গাড়িতে ওঠার কিছুক্ষণের মধ্যেই ড্রাইভারের পাশ থেকে জিজ্ঞেস করেছিল, "ম্যাডাম, একটা কাজের মেয়ের অভিমান ভাঙাতে আপনি এতদূর ছুটে এসেছেন, এটা কেমন যেন একটু অ্যাবসার্ড লাগছে। অন্য কোনও ব্যাপার নেই তো?"

"অন্য ব্যাপার বলতে?"

"বাড়ির গয়না-টয়না চুরি করে চলে এসেছে কি? তাহলে কিন্তু আমরা গিয়ে উদ্ধার করতে পারব না। গ্রামের লোক প্রবল ঝামেলা বাধাবে আমাদের সঙ্গে। এসব কেস পুলিশের হাতেই তুলে দেওয়া ভাল। ওরা ঠিক চাপ দিয়ে বের করে আনবে। আমাদের হয়তো কিছু খরচা হবে পুলিশের জন্য। তা হোক, জিনিসটা তো পাওয়া যাবে।"

পিছনের সিটে বসে থাকা বসুধা জানলার বাইরে তাকিয়ে বলেছিল, "সেরকম কিছু ঘটেনি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

সুপ্রকাশকে কেন এত নির্ভরযোগ্য মনে করে রত্না, বোঝা যাচ্ছে না। বসুধার আজকের এই কাজটাকে মোটেই সিরিয়াসলি নেয়নি সুপ্রকাশ। ওর

anarboi.com

কারণে বেলা করে বেরোতে হয়েছে।

আধঘণ্টাও চলেনি গাড়ি, আড়মোড়া ভেঙে সামনের সিট থেকে সুপ্রকাশ বলে উঠেছিল, "বাইরে এত চা-বাগান দেখছেন, চা খেতে ইচ্ছে করছে না আপনার?"

ভদ্রতার খাতিরে বসুধা বলেছিল, "আপনার বোধহয় করছে।"

আর কিছু বলতে হয়নি, প্রথমেই যে-চায়ের দোকান পড়ল, সেখানেই ড্রাইভারকে বলল গাড়ি দাঁড় করাতে। এখানেই প্রায় আধঘণ্টা পার। বসুধার মনে হচ্ছে, সুপ্রকাশের কোথাও একটা ইগো প্রবলেম হচ্ছে। শোভাকে খোঁজার কারণ হিসেবে ও যতক্ষণ না কোনও সন্তোষজনক উত্তর পাচ্ছে, তার আগে পর্যন্ত কাজটাকে পণ্ড করে যাওয়ার চেষ্টা করে যাবে।

"চলুন, যাওয়া যাক," কাছে এসে বলল সুপ্রকাশ।

চা খাওয়া অনেক আগেই শেষ হয়েছে বসুধার, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পার্স থেকে টাকা বের করার আগেই সুপ্রকাশ বলে, "আমি দিয়ে দিয়েছি।"

ড্রাইভার কখন জানি গিয়ে বসেছে দোকানে। সিগারেট টানছিল, সুপ্রকাশ আর বসুধাকে গাড়ির দিকে এগোতে দেখে দৌড়ে আসে।

আবার জঙ্গল, চা-বাগান পাশে রেখে ছুটে চলেছে গাড়ি। ডুয়ার্সের প্রকৃতি যে এতখানি সুন্দর, ধারণা ছিল না বসুধার। এখানকার ভ্রমণবৃত্তান্ত যা শুনেছে এবং পড়েছে, মনে হত বাড়িয়ে বলা। যেখানে পাহাড় নেই, সমুদ্র নেই, সেটা আবার বেড়াতে যাওয়ার জায়গা হল নাকি! তাই কখনও এখানে আসার জন্য বাবা-মা'র কাছে বায়না করেনি বসুধা। এখন মনে হচ্ছে, খুব ভাল করেছে। মাথায় অন্য চিন্তা নিয়ে, তাকে দুশ্চিন্তাই বলা যায়, প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় না।

এক-একবার মনে হচ্ছে শোভা আর নেই, খানিক বাদেই আশা জেগে উঠছে, আছে, নিশ্চয়ই আছে। ঠিক যেমন এই গাড়ির সামনের কাচে ঝাপিয়ে পড়ছে গাছের ছায়া, আবার একটু পরেই উজ্জ্বল রোদ। প্রকৃতির অনুষঙ্গেও চলে আসছে আশঙ্কার রেশ।

এর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সুপ্রকাশের সঙ্গে আলগা গল্প জুড়তে যায় বসুধা। বলে, "আপনাদের এই জায়গাটা এত সুন্দর, আমার সেভাবে ঘোরা হবে না।"

"কেন, অসুবিধে কোথায়?"

"একে তো রত্না পা ভেঙে পড়ে আছে। ওর কাছে এসে ওকে না নিয়ে ঘোরার কোনও মানেই হয় না। আর তাছাড়া শোভার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেই আমার এখানকার কাজ শেষ।"

"আজ, কাল দু'দিন আছেন তো? টিকিট কেটে রেখেছেন?"

"টিকিট কাটা নেই। তবে দু'দিন আছি।"

"এত শর্ট নোটিসে আশা করছেন কীভাবে যে রিজার্ভেশন পাবেন?"

"না পেলে বাসে যাব।"

"সেটা খুবই কষ্টকর। তবে চিন্তা করতে হবে না। টিকিটের ব্যবস্থা আমি করে দেব। হাতে যখন আপনার দু'দিন সময় আছে, মেয়েটাকে খোঁজার সঙ্গে-সঙ্গে দু'-একটা জায়গায় বেড়িয়ে নিতে পারেন। এই যেমন ধরুন ফুন্টশোলিং, জলদাপাড়া, সামচি সবই এক-দেড়ঘণ্টার পথ। মাদারিহাটে আজ রাতে স্টে করে গেলে, বেড়ানো, মেয়েটাকে খোঁজা দুটোই হয়ে যাবে।"

"মাদারিহাটে কোথায় থাকব?"

"কেন! হোটেলে। ভাল বাংলো আছে।"

"একা হোটেলে থাকব!" ছদ্ম বিস্ময়ে বলে ওঠে বসুধা, সুপ্রকাশের পরামর্শে ধান্দার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে যেন।

সুপ্রকাশ বলে, "একা কেন থাকবেন! আপনার জন্য একটা ফার্স্টক্লাস রুম বুক করে দেব। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দেব। যতই হোক, বন-জঙ্গলের জায়গা।"

পরিষ্কার ফ্লার্ট করছে লোকটা। একটু খেলিয়ে দেখতে চায় বসুধা। বলে, "আর আপনার বাড়ির লোক? কাল সকালে বউদির ডিউটি। ছেলে, মেয়েকে স্কুলের জন্য রেডি করা..."

"সে আর কী করা যাবে! বলব, বন্ধ ডেকেছে, আটকে গিয়েছি। এখানে তো যখন-তখন, যেখানে-সেখানে বন্ধ ডেকে দেয়।"

তারপর কিছুক্ষণ সুপ্রকাশ এখানকার লোকজনের বন্ধ ডাকার অপসংস্কৃতি নিয়ে বকবক করল। জায়গাটা এখনও যে কতদিক থেকে পিছিয়ে, তারও একটা তালিকা দিল ভদ্রলোক। বসুধা কিছুক্ষণ কথা চালিয়ে চুপ করে গেল। সুপ্রকাশের বক্তব্যগুলো যে একপেশে, সেটা বুঝতে অসুবিধে হয়নি বসুধার।

আবার জানলার বাইরে চোখ রাখে বসুধা। রাস্তার দু'পাশের ঢালুতে শুধুই চা-বাগান। উজ্জ্বল রোদ কচি চা-পাতায় মিশে কেমন যেন আদুরে হয়ে গিয়েছে। দেখা যাচ্ছে পিঠে ডেকো ঝুলিয়ে চা-পাতা তুলছে মেয়েরা। তাদের পরনে রঙিন পোশাক।

গাড়িটা এখন চলেছে চা-বাগানের পাশে সমান্তরাল রাস্তা দিয়ে। এক বৃদ্ধাকে দেখা গেল রাস্তার পাশে বসে জিরোতে। হাঁটু পর্যন্ত ছেঁড়াফাটা জুতো। মুখে প্রচুর ভাঁজ, তবু বসুধাকে দেখে অমনিল হাসলেন। হেসে না উঠলে মনে হত বুঝি পাথরের ভাস্কর্য। কতরকম দুঃখকষ্ট সহ্য করেও এরা প্রাণপূর্ণ। কাজকর্ম করছে, গল্প আড্ডা চলছে, অভ্যর্থনার হাসি হাসছে বহিরাগতদের দেখে। শোভাও তো এদের একজন হয়ে থাকতে পারত। মাত্র পনেরো বছর বয়সেই ওকে সাজিয়ে দেওয়া হল শহরের থালায়।

ফোন বাজছে বসুধার। বোধহয় মা। কাল পৌঁছনো খবর দেওয়ার পর আর ফোন করা হয়নি। পার্স থেকে ফোন বের করে থমকে যায় বসুধা, স্ক্রিনে অনুপমের নাম। বেজেই যায় ফোন, বসুধা ধরে না। সামনের সিট থেকে ঘাড় ফেরায় সুপ্রকাশ। বসুধা কেটে দেয় ফোন। ঠিক করে কলকাতায় ফিরেই এই নম্বরটা বাতিল করে নতুন কানেকশন নেবে।

জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকে বসুধা। ফোনটা আসার কারণেই কি না কে জানে, প্রকৃতিকে এখন আর ততটা ভাল লাগছে না।

মেসেজের রিং বেজে উঠল। চমকে ওঠে বসুধা। অনুপম লিখেছে, 'ইউ আর নাউ অ্যাট জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট। আই উইল ট্র্যাক ইউ ডাউন এনিওয়ে। ইউ হ্যাভ ডান ইনজাস্টিস। ইন দিস সিচুয়েশন ইউ শুড নট হ্যাভ লেফ্‌ট ইয়োর পেরেন্টস।'

পরিষ্কার হুমকি। তবে এমনভাবে ঘুরিয়ে লেখা হয়েছে, আইনের ফাঁদে ফেলা যাবে না। তবু মেসেজটা ডিলিট না করে বক্সে রেখে দেয় বসুধা।

সুপ্রকাশ মাথা না ঘুরিয়ে বলে ওঠে, "ফোন ধরলেন না দেখে, মেসেজ পাঠাল?"

বুক ধক করে ওঠে বসুধার, এ কী করে জানল ব্যাপারটা! পরক্ষণেই নিজেকে শুধরে নেয়, কথাটা সুপ্রকাশ সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বলেছে। বিশেষ কাউকে উল্লেখ করে বলেনি। বাহাদুরি দেখানো হল আর কী।

কপট প্রশংসার সুরে বসুধা বলে, "বাবা, আপনার তো দারুণ আই কিউ! কে ফোন করল সেটা কি আন্দাজ করতে পারলেন?"

"না। অতটা বুদ্ধি আমার নেই। তবে কলটা এড়াতে চাইলে অন্য সকলে যা করে, তাই করতে পারেন। মোবাইল পুরোপুরি বন্ধ করে দিন। ঘণ্টাখানেক বাদে আবার খুলবেন।"

অ্যাডভাইসটা মন্দ নয়। বসুধার মাথায় আগেই আসা উচিত ছিল। ফোনের সুইচ অফ করে দেয় বসুধা।

সুপ্রকাশ বলে, "ফোন করার প্রয়োজন পড়লে, আমার সেট থেকে করতে পারেন।"

"থ্যাঙ্ক ইউ। আপাতত দরকার নেই," বলল বটে বসুধা, কিন্তু মেসেজটা তাকে একটু কাহিল করে ফেলেছে। চিন্তা হচ্ছে বাবা, মায়ের জন্য। সত্যিই তো দু'জনকেই অসহায় অবস্থায় ফেলে আসা হয়েছে। অনুপম যদি ফোন করে ধমকায় অথবা বাড়িতেই চড়াও হয়, বাবা-মা বিপাকে পড়ে যাবে। ঝগড়াঝাঁটি করার ক্ষমতা তাদের নেই। চেঁচিয়ে পাশের বাড়ির লোককে ডাকতেও যাবে না। তাহলেই জানাজানি হয়ে যাবে সব। শুধু-শুধু ঝামেলায় পড়বে দু'জন।

মা'কে কি একবার ফোন করে দেখবে বসুধা, এর মধ্যেই কোনও হুমকি-টুমকি এসেছে কি না? এলে অবশ্য মা ফোন করে জানাত। এখন আবার ফোন অফ রাখতে হচ্ছে। সুপ্রকাশের ফোন থেকে এখনও মায়ের খবর নেওয়া যায়। কথাটা ভেবেও নিজেকে নিরস্ত করল বসুধা, তার এই অস্থিরতাটাই তো চাইছে অনুপম। এত টেনশন করলে চলবে না। নিজেকে বশে রেখে এগোতে হবে। বরং অনুপমকেই এমন শিক্ষা দিতে হবে, ভবিষ্যতে কোনও মেয়েকে প্রতারণা করার আগে যেন থমকে যায়।

মেসেজটা থেকেই বোঝা যায়, লোকটার রুচিবোধ কেমন। বসুধা বুঝতে পারে, অনুপমের মাসি মেসোকে সে ফাঁকি দিতে পারেনি। বসুধাকে ঠিকই চিনে নিয়েছে। পরে ফোন করে জানিয়েছে অনুপমকে। বসুধা যেহেতু এনজেপি-তে নামেনি, ওরা ধরে নিয়েছে জলপাইগুড়ির কোথাও একটা নামবে। এটুকু আন্দাজ করতে বিশাল কিছু বুদ্ধি লাগে না।

মাসি, মেসো নিশ্চয়ই কুশলের কথাও বলেছে। নাম হয়তো বলতে পারেনি, শুনতে পায়নি অতদূর থেকে। একেবারে দরজার গায়েই ওদের বার্থ ছিল। বসুধার সঙ্গে একটা ছেলে ছিল শুনে, অনুপম কী ভাবছে, জানতে ইচ্ছে করছে বসুধার। আর-একটা ব্যাপারেও একটু খটকা লাগছে, জলপাইগুড়ি জেলায় কেন বসুধা এসেছে, এটা কি ধরতে পারল না অনুপম? বুঝতে পারলে একটা ইঙ্গিত দিতই। নাকি শোভার এখনকার ঠিকানা অনুপম এত ভাল করে জানে, ওর মাথায় আসবে না, শোভাকে খুঁজতে কেউ দেশের বাড়ি যেতে পারে। সঙ্গে কুশল থাকার দরুন ও আরও মিসগাইডেড হবে। ভাববে,

ছেলেটির সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছে বসুধা। এটা মনে হওয়ার পর অনুপমের তো নিশ্চিন্ত থাকার কথা নয়। কুশলের পরিচয় জানতে চাইবেই। অথচ এই ব্যাপারেও কোনও প্রশ্ন করেনি সে। নানা প্রশ্ন, ভয়, আতঙ্ক, ধাওয়া করে চলে বসুধাকে।

"হাসিমারায় এসে গেলাম। এখান থেকে মাদারিহাট বারো-চোদ্দো কিলোমিটার," বলল সুপ্রকাশ।

বসুধা লক্ষ করে, তারা একটা আধা-শহরে এসে পড়েছে। সুপ্রকাশ ফের বলল, "এখানে একবার গাড়ি দাঁড় করাই, কী বলেন? লোহানিপাড়া মাদারিহাট, হাসিমারার মাঝের কোনও জায়গা হতে পারে।"

বসুধা কোনও উত্তর করে না। এই এলাকা সম্বন্ধে তার কোনও ধারণাই নেই। একটা বাজার মতো জায়গায় এসে ড্রাইভারকে গাড়ি সাইড করতে বলে সুপ্রকাশ।

গাড়ি থেকে নেমে সুপ্রকাশ কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল, ইতস্তত কাটিয়ে বসুধা ডেকেই বসে, "এই যে শুনুন, আপনার ফোনটা একবার দেবেন!"

সুপ্রকাশ ফিরে এসে পকেট থেকে ফোনটা বের করে এগিয়ে দেয়। ভদ্রতার হাসি হাসে বসুধা। সুপ্রকাশের মুখে খুশি-খুশি ভাব, বসুধা তার পরামর্শ গ্রহণ করেছে। বসুধার মনে একটাই অস্বস্তি, লোকটার কৌতূহলকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়ে গেল।

বাড়ির নম্বরে ফোন করে বসুধা। বেজে যাচ্ছে রিং। কেউ তুলছে না কেন? বসুধাদের বাড়িতে বেশিক্ষণ বাজে না ফোন, মা ঝপ করে তুলে নেয়।

বাবা তুলল ফোন। চাপা, ভীত কণ্ঠে বলল, "হ্যালো?"

বসুধা তো অবাক, বাবার গলার অবস্থা এরকম কেন? বসুধা বলে, "আমি বলছি।"

পরমুহূর্তে বাবার গলা অনেকটা স্বাভাবিক। "ও তুই! হ্যাঁ বল।"

বসুধার বুঝতে অসুবিধে হয় না, রায়বাড়ির ফোনের আশঙ্কায় বাবা এত সন্ত্রস্ত। বাবাকে বলে, "মাকে দাও।"

"ও এখন কাছাকাছি নেই। কী বলবি, আমায় বল। তুই ঠিকঠাক আছিস তো?"

বসুধার কপালে ভাঁজ পড়ে, প্রশ্ন এড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, "মা কি কোথাও বেরিয়েছে?"

"না, বাড়িতেই আছে। খেয়েদেয়ে এইমাত্র শুলো। ঘুমের ওষুধ দিয়েছি।"

ভীষণ হোঁচট খায় বসুধা। বিস্ময়ের সঙ্গে বলে, "কেন, ঘুমের ট্যাবলেট কেন? মায়ের তো কখনও এসব লাগে না!"

"বিয়ের দিনটা যত এগিয়ে আসছে, সারাক্ষণ চিন্তা করে যাচ্ছে। বেশ কয়েকবার ওকে নিজের মনে কথা বলতে দেখেছি। মিহির ডাক্তারকে সব জানালাম। নার্ভ রিল্যাক্স করার ওষুধ দিয়েছে, ওতে ঘুমও হবে। তুই আবার চিন্তা করতে..."

কথা শেষ করতে পারল না বাবা। ওপ্রান্ত থেকে মায়ের গলা শোনা গেল, "দেখেছিস, কেমন দায়িত্বজ্ঞানহীন। সকাল থেকে তোর ফোনের জন্য অপেক্ষা করছি। ফোন এল, তবু তোর বাবা আমাকে ডাকেনি।"

"তুমি ঘুমোচ্ছিলে বলেই ডাকেনি।"

"কোথায় আর ঘুম!...শোন, তোকে একটা দরকারি কথা বলার আছে। কাল রাত ন'টা নাগাদ অনুপমের বাবা ফোন করেছিল। জিজ্ঞেস করল, কনেযাত্রী ক'জন আসছে? আমি বললাম, ওসব মেয়ে জানে। তখন তোকে ফোন দিতে বলল। আমি বললাম, ক'দিনের জন্য বেড়াতে গিয়েছে। কোথায় জানতে চাইল। আমি বলে দিয়েছি, শান্তিনিকেতনে, ওর বন্ধুর বাড়ি। তোকে হয়তো এবার ফোন করবে।"

মায়ের কথা বলার মধ্যে একটা তাড়াহুড়ো ভাব লক্ষ করছে বসুধা। মাকে শান্ত করার জন্য বলে, "ঠিক আছে, আগে আমাকে ফোন করুক। যা বলার আমি বলে দেব। তুমি এসব নিয়ে খামোকা চিন্তা কোরো না। একবার বাবাকে ফোনটা দাও।"

"হ্যাঁ, বল," বাবার গলা।

"বাবা, তোমরাও তো ক'দিনের জন্য একটু বেড়িয়ে আসতে পার। পুরী বা দেওঘর। মায়ের টেনশনটা তাহলে একটু কমে।"

"বলেছিলাম, রাজি হল না। বলছে, বাইরে গেলে গুন্ডা লাগিয়ে হেনস্থা করবে ওরা। তার চেয়ে চেনা পরিবেশেই থাকা ভাল। তুই রত্নার কাছে আছিস, তাতেও তোর মা নিশ্চিন্ত হতে পারছে না।"

রত্না পা ভেঙে বসে আছে, বাড়িতে জানায়নি বসুধা। বাবাকে বলে, "মাকে বলো, রত্না এখন কলেজ যাচ্ছে না। আমার জন্য ছুটি নিয়েছে। এই তো আজ আমরা হাসিমারায় এসেছি। দারুণ জায়গা।"

"বাঃ, খুব ভাল। তুইও বাড়ি নিয়ে বেশি ভাবিস না। আমি তোর মাকে ঠিক সামলে নেব।"

বসুধা বুঝতেই পারে বাবা তাকে প্রবোধ দিচ্ছে। বাবা নিজে মোটেই স্বস্তিতে নেই। বসুধা জিজ্ঞেস করে, "ভাইয়ের খবর কী? ফোনটোন করছে?"

"করে। তবে ওকে বাড়ির সব খবর বলি না। পরীক্ষা চলছে পুরোদমে।"

"ঠিক আছে, ওকে এখন এসব জানাতে হবে না। তাছাড়া তোমরা একটু বেশিই চিন্তা করছ। অপরাধ যেন আমরা করেছি।...আচ্ছা, এখন রাখছি। ওরা যদি আবার ফোন করে, আমাকে জানিয়ো। এখানে অনেকসময় টাওয়ার থাকছে না, দিনে যদি আমাকে না পাও, রাত্তিরে কোরো। রত্নার বাড়িতে টাওয়ার থাকে।"

"আচ্ছা," বলে ফোন কাটে বাবা।

এতক্ষণ গাড়িতে বসে ছিল বসুধা। সুপ্রকাশ নেমে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ড্রাইভারও নেমে গিয়েছিল। গাড়ির মধ্যে এখন দমবন্ধ লাগছে বসুধার। দুশ্চিন্তাগুলো যেন চেপে বসছে ঘাড়ে।

দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ায় বসুধা। চৌরাস্তার একটু আগে দাঁড়িয়েছে ওরা। রাস্তার উপরেই ধার দিয়ে বাজার বসেছে। নানা ধরনের সব্জি। রাস্তার দোকানগুলোর পিছনে টিনের চালের স্থায়ী দোকান।

সুপ্রকাশ পাশে এসে দাঁড়ায়।

বসুধা জিজ্ঞেস করে, "কিছু খোঁজ পাওয়া গেল?"

গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে মাথা নাড়ে সুপ্রকাশ। "না, অনেক লোককে জিজ্ঞেস করলাম। নামই শোনেনি কেউ।"

হতাশ হয় বসুধা। সুপ্রকাশকে অনুসরণ করে গাড়িতে গিয়ে বসে। ড্রাইভার আগেই চলে এসেছে, স্টার্ট দেয় গাড়ি।

শহর পাতলা হতে শুরু করেছে। আবার রাস্তার দু'পাশে ফাঁকা মাঠ, ইতিউতি বড়-বড় গাছ। কিছু বাংলো প্যাটার্নের প্রাচীন বাড়ি। সাহেবদের ছেড়ে যাওয়া মনে হচ্ছে।

সামনের সিট থেকে সুপ্রকাশ বলে, "নামটা আপনি ঠিক বলছেন? মানে, শোনার কোনও ভুল হয়নি তো?"

"না। কোনও ভুল হয়নি।"

"আসলে এত কাছে এসেও যদি দেখি এলাকার লোক জায়গাটার নাম শোনেনি, তখনই সন্দেহ হয় কোথাও একটা ভুল হচ্ছে আমাদের।"

সুপ্রকাশের কথার পিঠে বসুধা বলে, "জায়গাটা তো মাদারিহাটের কাছে। ওখানে গিয়ে একবার দেখা যাক না।"

সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে সুপ্রকাশ। এই প্রথম ড্রাইভার নিজের থেকে কথা বলে, "নাম ক্যায়া হ্যায় জাগা কা?"

"লোহানিপাড়া। চেনো তুমি?" জানতে চায় বসুধা।

দু'পাশে মাথা নেড়ে ড্রাইভার বলে, "কভি সুনা নেহি।"

আরও খানিকক্ষণ গাড়ি চলার পর একসময় ড্রাইভার ঘোষণা করল যে, মাদারিহাট এসে গিয়েছে। বসুধা ঘড়ি দেখে, এখানেই সাড়ে বারোটা বাজতে চলল। প্রায় দু'-ঘণ্টা ধরে লোকজনকে জিজ্ঞেস করে লোহানিপাড়ার কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না।

বসুধারা এখন সুসজ্জিত হোটেলের লাউঞ্জে লাঞ্চ করতে বসেছে। জায়গাটা খুবই সুন্দর। ছোট্ট টিলার উপর হোটেলটা। সামনে অনেকটা জায়গা জুড়ে রঙিন ফুলে ভরা বাগান। মাঝে-মাঝে কাঠের কটেজ। হিসেব মতো শীত চলে গিয়েছে অনেকদিন। মূল হোটেলটা সিমেন্টের, চারতলা। ঘরের সামনে ব্যালকনিগুলো দারুণ। হোটেলের পিছন দিকটাও ঘুরে এসেছে বসুধা, গাছপালা ভর্তি ঢালু এলাকা। শীর্ণ একটা নদী বয়ে চলেছে। চারদিক ঘুরে দেখার পর খেতে বসেছে বসুধা, মাঝে-মাঝেই চোখ চলে যাচ্ছে নির্দিষ্ট একটি কটেজের দিকে, বারান্দায় মাথা নিচু করে বসে রয়েছে একটি মেয়ে। বারান্দার থেকে মাটির দূরত্ব এক ফুটও নয়। মেয়েটির পা মাটিতে। মেয়েটির একঢাল চুল, পরনে সাদা গাউন। এখান থেকে যতটুকু আন্দাজ করা যাচ্ছে, মেয়েটি খুবই ফর্সা। মাথা নিচু করে মেয়েটি তখন থেকে কী ভেবে যাচ্ছে? কখনও-সখনও মাটি থেকে নুড়ি তুলে অলসভাবে ছুড়ে দিচ্ছে।

"কী দেখছেন?" খেতে-খেতে জিজ্ঞেস করে সুপ্রকাশ। সে বসেছে বসুধার মুখোমুখি।

সুপ্রকাশের প্রশ্নের উত্তর একটু দেরি করে দেয় বসুধা। বলে, "মেয়েটা ওইভাবে তখন থেকে বসে আছে কেন, সেটাই ভাবছি।"

"কেন আবার, পার্টনারের সঙ্গে হয়তো ঝগড়াঝাঁটি। কিংবা রাতে এত ড্রিঙ্ক করেছে লোকটা, এখনও উঠতে পারেনি। তাই হয়তো মেয়েটার মুড অফ।"

ব্যাপারটা নিয়ে আর কথা বাড়ায় না বসুধা। চারদিকে তাকিয়ে বলে, "জায়গাটা সত্যিই খুব সুন্দর। এখানে এসব ঝগড়া-টগড়া মানায় না।"

"স্পটটা আপনার ভাল লেগেছে? থাকবেন নাকি রাতে? বেলা যা

anarbon.com

হয়েছে, মনে তো হয় না আজ আর ওই গ্রামে পৌঁছতে পারব।"

খাওয়া শেষ বসুধার, টেবিল ছেড়ে উঠতে-উঠতে বলে, "না না, আজকের মধ্যেই খুঁজে পেতে হবে। আমার হাতে বেশি সময় নেই।"

"তাড়াতাড়ি লোকেট করতে গেলে থানায় আমাদের যেতেই হবে।"

"থানায় আমি কিছুতেই যাব না। আরও লোকজনকে জিজ্ঞেস করতে হবে। কেউ-না-কেউ ঠিকই দিতে পারবে জায়গাটার সন্ধান।"

বসুধা হাত-মুখ ধুতে এগিয়ে যায় বেসিনের দিকে। সুপ্রকাশ তাকে থানায় নিয়ে যাবেই। এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না, শোভা কিছু চুরি করে পালিয়ে আসেনি। আসলে বসুধার মিথ্যেটা বেশ কমজোরি, কাজের লোকের মান ভাঙাতে কেউ এতদূর আসবে না। এদিকে সত্যিটাও বলা যাবে না। থানায় গেলে কিছু তো একটা বলতেই হবে, শোভার কোনও অপরাধের কথা। অভিমান করে পালিয়ে আসা মেয়েদের খুঁজে দেওয়ার জন্য সরকার তাদের মাইনে দেয় না।

রুমালে মুখ মুছে বসুধা লাউঞ্জের সোফায় গিয়ে বসে।

ড্রাইভার সন্তু থাপা (নামটা খানিক আগে জিজ্ঞেস করে জেনেছে বসুধা) বলল, "পোস্ট অফিস থানাকে পাস সবকা পাতা রহতা হ্যায়।"

উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসে বসুধা, চোখেমুখে আশার আলো। বলে, "একদম ঠিক বলেছ তো। কথাটা আমাদের মাথাতেই আসেনি।"

সুপ্রকাশও শুনতে পায় সন্তুর পরামর্শ। বলে ওঠে, "তা বাবা, এই বুদ্ধিটা এতক্ষণ তোমার মাথায় আসেনি কেন? ফালতু ঘুরে মরলাম।"

নির্মল হেসে সন্তু পেটে চাপড় মেরে বলে, "পেট মে দানা পড় গয়া, দিমাক ভি খুল গিয়া।"

ওর রসিকতায় খিলখিল করে হেসে ওঠে বসুধা এবং একই সঙ্গে চোখ চলে যায় সেই কটেজটার দিকে। বসুধার হাসি শুনে মাথা তুলেছে মেয়েটা, কী ভীষণ করুণ দেখাচ্ছে ওর মুখ।

পোস্ট অফিস খুঁজে পেতে বেশি সময় লাগল না। যথেষ্ট ব্যস্ত অফিস। বেশ হইচই। তবু সেই ঘুপচি ভাব, প্রাচীন গন্ধটা আছেই। বসুধা আর সুপ্রকাশ সোজা চলে এসেছে পোস্টমাস্টারের ঘরে।

ষাট ছুঁই-ছুঁই মাস্টারমশাই লোহানিপাড়ার নাম শুনে বললেন, "না, মনে করতে পারছি না গ্রামটার নাম। দশ বছরের উপর হয়ে গেল এই পোস্ট অফিসে আছি। জায়গাটা আছে অথচ নাম জানি না, এটা তো হতে পারে না। আচ্ছা, কোনও ল্যান্ডমার্ক বলুন তো?"

বসুধা বলে উঠল, "ওখানে একটা নদী আছে। খাউচন নদী।"

"ওরকম চিং-চং নদী এখানে অনেক আছে। তাছাড়া নদী শুধুমাত্র একটা গ্রাম দিয়ে বয়ে যায় না। অন্য এমন কিছু বলুন যেটা ওই গ্রামেই আছে।"

বসুধা মরিয়া সুরে বলে, "যতদূর শুনেছি, গ্রামটায় খুবই গরিব মানুষের বাস। ওদের তো চিঠিপত্র বড় একটা আসে না। একটু ফাইল-টাইল খুলে দেখুন না, যদি কোনও রেকর্ড পান!"

কী একটা ভেবে ভদ্রলোক বললেন, "দাঁড়ান, সবচেয়ে পুরনো পোস্টম্যানকে ডাকি। উনি হয়তো হদিশ দিতে পারেন।"

টেবিলে রাখা পুরনো আমলের পেতলের গোল ঘণ্টার উপর চাপড় মারলেন মাস্টারমশাই। ঘরে ঢুকল একজন যুবক।

"কারজিবাবু কি লাইনে বেরিয়ে গিয়েছেন?"

ছেলেটি বলল, "না। চিঠি সর্ট করছে।"

"একবার ডাকো তো।"

ছেলেটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। খানিক বাদেই যিনি চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঢুকলেন, দেখেই বোঝা যায় বয়স অন্তত সত্তর তো হবেই। রোগা চেহারা, চোখে ঘোলাটে কাচের চশমা।

পোস্টমাস্টার ওঁকে উদ্দেশ করে বললেন, "লোহানিপাড়া নামে কোনও গ্রাম আছে আমাদের জোনে? এঁরা খোঁজ করছেন।"

কারজিবাবু বসুধা আর সুপ্রকাশের দিকে ঘাড় ফেরালেন। আশ্বাসসূচক ঘাড় নেড়ে বললেন, "আছে। এখন আর ওদের চিঠিপত্তর আসে না। কখনও-সখনও মানি অর্ডার আসে। আমিই ডেলিভারি দিই।"

"জায়গাটা ঠিক কোথায় একটু বলুন না প্লিজ। সেই সকাল থেকে ঘুরছি," বলল সুপ্রকাশ।

কারজিবাবু বললেন, "বড়রাস্তা ধরে বীরপাড়ার দিকে এগিয়ে যাবেন। রাস্তার ধারেই একটা কারখানা দেখবেন। কারখানার পাশ দিয়ে একটা চওড়া সুরকির পথ গিয়েছে। সেই পথ ধরে পৌঁছবেন ভাঙাচোরা বাংলোবাড়িতে। চা-বাগানের অফিস ছিস ওটা। বাংলোর পাশে পায়ে-চলা মাটির রাস্তা। ওটা দিয়ে এগিয়ে গেলেই লোহানিপাড়া। খুবই ছোট জায়গা।"

"পায়ে-চলা রাস্তাটা কতটা?" জিজ্ঞেস করে সুপ্রকাশ।

"এই ধরুন মাইল চারেক।"

চমকে ওঠে সুপ্রকাশ। "ওরে বাবা! অতটা রাস্তা! গাড়িও তো যাবে না।"

কারজিবাবু পোস্টমাস্টারের অনুমতি চাইলেন, "আমি এবার যেতে পারি?"

সুপ্রকাশের সঙ্গে বসুধা বেরিয়ে আসে পোস্ট অফিস থেকে।

সুপ্রকাশ জিজ্ঞেস করে, "কী ভাবছেন, যাবেন?"

"চলুন, কাছাকাছি তো যাই।"

প্রায় একঘণ্টার উপর লাগল চা-বাগানের বন্ধ অফিসের সামনে পৌঁছতে। জায়গাটা ভীষণ নির্জন। বাড়িটার পাশ দিয়ে পায়ে-চলা পথটা দেখা যাচ্ছে কিছুদূর পর্যন্ত। বাকিটা গাছপালায় ঢাকা। রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে বিশ্বাসই হচ্ছে না, ভিতরে কোনও গ্রাম থাকতে পারে। লোহানিপাড়ায় আজ যে যাওয়া যাবে না, বোঝাই যাচ্ছে। তবু মুখ ফুটে এখনও সেটা বলেনি বসুধা। ড্রাইভার সন্তু জঙ্গলের ভিতর খানিকটা ঢুকে একটা গাছের ডাল ভেঙে অন্য একটা গাছ থেকে কী যেন পাড়ার চেষ্টা করছে। সুপ্রকাশ একটা পিলারের উপর বসে পা ছড়িয়ে সিগারেট টানছে। ওকে এই প্রথম সিগারেট খেতে দেখল বসুধা।

পায়ে-পায়ে সে এগিয়ে যায় সুপ্রকাশের কাছে। বলে, "আপনি সিগারেট খান? কাল থেকে তো একবারও দেখিনি।"

"খাই না। এখন একটু ইচ্ছে হল। ড্রাইভারের থেকে নিয়েছি।"

"টায়ার্ড লাগছে?"

"কী করে বলি বলুন! মেয়ে হয়ে আপনার এখনও যা এনার্জি দেখছি!"

হেসে ফেলে বসুধা। বলে, "চলুন ফেরা যাক। আজ তো আর যাওয়া যাবে না গ্রামে।"

"বলছেন?" বলে খুশি-খুশি মুখে পিলার ছেড়ে উঠে আসে সুপ্রকাশ। ড্রাইভারের উদ্দেশে হাঁক পাড়ে, "সন্তু, চলে আও। লটনা হ্যায়।"

খুবই ক্লান্ত ভঙ্গিতে গাড়ির দিকে এগোচ্ছে সুপ্রকাশ, বিনা কারণে বেচারার অনেক ধকল গেল।

গাড়ির কাছে পৌঁছে বসুধা সুপ্রকাশকে বলে, "আপনি আমার সঙ্গে পিছনেই বসুন। আরামে যেতে পারবেন।"

সুপ্রকাশ আপত্তি জানায় না।

খানিকদূর যাওয়ার পর সুপ্রকাশ জিজ্ঞেস করে, "তাহলে কী করবেন?"

প্রশ্নটা বুঝতে অসুবিধে হয় না বসুধার। বলে, "কী আর করব, কাল ভোর-ভোর সন্তুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব।"

"রত্না রাজি হবে না।"

"না হলেও কিছু করার নেই। গ্রামটায় যেতে আমাকে হবেই। আপনি তো সকালে বেরোতে পারবেন না।"

"দেখি, পারি কি না!"

হাইওয়েতে এসে পড়েছে গাড়ি। সিটে মাথা হেলিয়ে সুপ্রকাশ বলে, "আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?"

"করুন।"

"আপনার সঙ্গে রত্নার কি বড় কোনও ঝগড়া হয়েছিল?"

"কেন বলুন তো?"

"না, আসলে ও কিন্তু কোনওদিন আপনার কথা আমার কাছে বলেনি। যখনই আপনি ফোন করে জানালেন, এখানে আসছেন, তখন আপনাদের বন্ধুত্ব নিয়ে কত কথা!"

সুপ্রকাশ ঠিক কী বলতে চাইছে, মাথায় ঢুকছে না বসুধার। সে বলে, "তো, এতে আপনি ঝগড়াটা কোথায় দেখলেন?"

"আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, কোনও কারণে আপনাদের বন্ধুত্বে চিড় ধরেছিল। অভিমান ভুলে আপনিই প্রথম এগিয়ে এলেন বন্ধুত্বটা জুড়তে। ঠিক বলছি কি?"

"সে একটা ছেলেমানুষি ব্যাপার। আমাদের তখন এমএ-র ফার্স্ট ইয়ার। দু'জনে মিলে একটা ছেলের প্রেমে পড়লাম। আমাদের থেকে এক বছরের সিনিয়র। কুশলদা। দারুণ দেখতে। মেয়েদের দিকে তাকায়ই না। নিজের সৌন্দর্য নিয়েও কোনও হুঁশ নেই। সব সময় কেমন যেন অন্যমনস্ক।"

থেমে গেল বসুধা, নিখাদ মিথ্যেই বলতে চেয়েছিল, কুশল ঢুকে যাচ্ছে। মিথ্যের মধ্যে একটু সত্যি ঢুকলে অবশ্য ব্যাপারটা আরও প্রাণবন্ত হয়।

"তারপর?" জানতে চাইল সুপ্রকাশ।

"তারপর আর কী, যা হয়। রত্না লাজুক। আমিই প্রোপোজ করলাম আগে। কুশলদা অ্যাকসেপ্ট করল। বেশ কয়েকটা ডেটিংও হল। ও মা, হঠাৎ দেখি কুশলদা আমার উপর রেগে কাঁই। কী ব্যাপার? জানতে চাইতে, কুশলদা যা বলল, আমি তো শুনে থ। রত্না দীপকের কথা সব বলে দিয়েছে। আমি তখন সবে ভাবতে শুরু করেছি, দীপককে কাটিয়ে পার্মানেন্টলি কুশলদার কাছে চলে যাব। তখনই বেইমানিটা করে দিল।"

"তারপর কী হল?"

"কী আর হবে! কুশলদা কেটে গেল। না পেল রত্না, না আমি। সেই থেকে ঝগড়া, কথা বন্ধ। তারপর তো অনেকদিন কেটে গিয়েছে, আমি রত্নাকে মিস করি। ও-ও নিশ্চয়ই করে। শোভাকে খোঁজার জন্য আমি বীরপাড়ায় উঠতে পারতাম। আমার এক ক্লোজ় রিলেটিভ থাকে। ভাবলাম, এদিকেই যখন আসছি, রত্নার কাছেই উঠি।"

বড় একটা শ্বাস ছেড়ে সুপ্রকাশ বলল, "ও এই ব্যাপার! এখানে তো রত্নারই দোষ দেখতে পাচ্ছি। আপনিই বরং ক্ষমা করে দিয়েছেন।"

বসুধা আর কথা বাড়ায় না। একটানা মিথ্যে বলে মাথাটা বেশ ঝরঝরে লাগছে। নতুন করে ভাল লাগতে শুরু করেছে বাইরের দৃশ্য। মনে পড়ছে কুশলের কথা। ওর অসুস্থ আত্মীয় কেমন আছেন? একবার কি খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল? ওই বা কেমন ছেলে, মেসেজের উত্তর দিল না! ওর সেই আত্মীয় মারা যাননি তো? তাহলে মেসেজের উত্তর দেওয়ার কথা খেয়াল থাকবে না। রাতের দিকে কুশলকে একটা ফোন করবে ঠিক করে বসুধা।

এরই মধ্যে হঠাৎ সে টের পায়, বাঁ-হাতের চেটোর পাশটা ঠেকছে সুপ্রকাশের হাতে। সুপ্রকাশ কি ঘুমিয়ে পড়ল? আড়চোখে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করে বসুধা, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। গাড়ির ভিতরটা বেশ অন্ধকার। বাইরে নামছে সন্ধে। সিটে রাখা হাতটা সামান্য সরিয়ে নেয় বসুধা। খানিক বাদে আবার সেই স্পর্শ। উদ্দেশ্য টের পেতে অসুবিধে হয় না, বসুধা নিশ্চিত হওয়ার জন্য হাত আর সরায় না। ধীরে-ধীরে সুপ্রকাশের আঙুল উঠে আসে বসুধার চেটোর ওপর। বিষম আবেগের ভান করে সুপ্রকাশের হাতটা বসুধা তুলে নেয় নিজের তালুতে। পরমুহূর্তেই চরম ভর্ৎসনার হাসি হেসে সজোরে সরিয়ে দেয় সুপ্রকাশের হাতটা।

আজ সকালে ঘুম ভেঙেছিল একটা হই-হুল্লোড়ের মধ্যে। বিছানায় বসেই 'হাতি' শব্দটা বেশ কয়েকবার শুনল কুশল। তখন আর হইচইয়ের কারণটা বুঝতে অসুবিধে হয়নি। বীরপাড়ায় হাতি চলে আসাটা খুবই পুরনো ব্যাপার। ছোটবেলায় যখন মামাবাড়ি আসত, বেশ কয়েকবার নেপালি বস্তিতে হাতি আসার খবর শুনে দৌড়ে দেখতে গিয়েছে। মাকে শুনিয়েছিল সেই আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কাহিনি।

কুশলের মা-ও তার ছোটবেলায় অনেকবার হাতি দেখেছে। কুশলের শুনতে-শুনতে সেসব গল্প মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।

মা বলত, "ওদের মধ্যে ভগবান আছেন। দেখলেই নমো করবে। আমরাও করতাম। আমাদের ছোটবেলায় বছরে এক দু'বার হাতি চলে আসত গ্রামে। ক্ষয়ক্ষতি খুব কিছু করত না। বাগানের কলাগাছগুলো উপড়ে নিত। কাঁঠাল পেড়ে পা দিয়ে ভেঙে খেত। বাড়িঘরদোর বড় একটা ভাঙত না। তবু পাকাবাড়ি করতে লোকে ভয় পেত। হাতিদের জন্য গৃহস্থরা ধান, কলা, আনাজপাতি সাজিয়ে রাখত সদরে। তারা খেয়েদেয়ে চলে যেত। তারপর তো লোকজন বাড়ল, পাকা বাড়িঘর হল। হাতিরা এখন আর আসে না। যদি বা পথ ভুলে চলে আসে, লোকেরা এমন রে রে করে ছুটে যায় যে, ওরা ভয়ে পালায়।"

হাতি আসার ঘটনাটা এই অঞ্চলের লোকের কাছে জল-ভাত। সেই তুলনায় আজ সকালে বাড়ির মধ্যে হইচইটা একটু বেশিই মনে হচ্ছিল। হাতি কি তাহলে শহরে ঢুকে এল? এই আশঙ্কায় মশারি তুলে বিছানা থেকে নেমে বাইরে এসেছিল কুশল। মামাবাড়ির সকলের মধ্যেই একটা হন্তদন্ত ভাব দেখতে পায়।

সামনে দিয়ে বাবলুকে যেতে দেখে কুশল জিজ্ঞেস করে, "কী হয়েছে রে? সবাই এত হাঁকডাক করছে কেন?"

"ও মা, তুমি জানো না! আমাদের স্কুলে হাতির পাল এসেছিল। দিদিমণির কোয়ার্টার ভেঙে দিয়েছে।"

"আমি কী করে জানব বল? আমি যে ঘুমোচ্ছিলাম।"

"ও বাবা! অত বন্দুক ফাটল, কিচ্ছু শুনতে পাওনি!" চোখ বড়-বড় করে বলেছিল ক্লাস সেভেনের বাবলু।

কুশল উত্তর দেয় না। বাবলু হন্তদন্ত হয়ে চলে যায়। রাখি তড়িঘড়ি পায়ে কোনও কাজে যাচ্ছিল, থমকে দাঁড়াল কুশলকে দেখে।

"কী গো, এই ঘুম থেকে উঠলে! বাবলুদের স্কুলে যাবে না? বাড়ির সবাই যাচ্ছে।"

"কেন যাচ্ছে রে? হাতির পাল তো চলে গিয়েছে।"

"তাতে কী হয়েছে! ওদের স্কুলের দেওয়াল, কোয়ার্টার সব ভেঙে দিয়েছে। সেসব দেখতেই তো যাচ্ছে লোকে। তুমি যাও, দাঁত মেজে নাও। চা দিচ্ছি। আমরা এক্ষুনি বেরোব।"

বিস্ময়ের গলায় কুশল বলেছিল, "এত উৎসাহের কী আছে, আমি তো বুঝতে পারছি না। হাতি তো এখানে প্রায়ই আসে। আমিই ছোটবেলায় দেখেছি।"

"এবার বুঝেছি, কেন তুমি গুরুত্বটা বুঝতে পারছ না! এতদিন হাতি এসেছে নেপালি বস্তি পর্যন্ত। এই প্রথমবার এপারের তেমন কোনও ক্ষয়ক্ষতি না করে রাতেরবেলা চুপি-চুপি চলে গিয়েছে ওপারে।"

রাখি থামতে কুশল বলেছিল, "এ তো সোজা ব্যাপার, হাতিগুলো এপারের নয়, ওপারের।"

"সেটাই তো সকলে আলোচনা করছে। ওপারে তো মাইলের পর মাইল চা-বাগান। হাতিগুলো তাহলে এল কোথা থেকে! জঙ্গল এলাকা বলতে তো চালসা। ওখান থেকেও যদি হাতি আসতে শুরু করে, তাহলে তো আমাদের হয়ে গেল," বলে রাখি চলে গিয়েছিল নিজের কাজে।

কুশলের অবশ্য হাতির তাণ্ডবের স্বাক্ষর দেখতে যাওয়ার কোনও আগ্রহ হয়নি। চা-জলখাবার খেয়ে বাড়িতেই বসে রইল। দেখল, মামিরা সব তার কিনে দেওয়া শাড়ি পড়ে স্কুলবাড়ি দেখতে যাচ্ছে।

উপহার যে সাদরে গ্রহণ হয়েছে, সেটা বোঝানোর জন্যই শাড়িগুলো পরা। যেন কোনও উৎসব অনুষ্ঠানে চলেছে।

কাল বিকেলে রাখির সঙ্গে মার্কেটে গিয়ে বাড়ির প্রত্যেকের জন্য পোশাক কিনেছে কুশল। প্রথম দোকানে গিয়েই দেখা হয়েছিল তনুশ্রীর সঙ্গে। কুশল নিশ্চিত, ঘটনাটা রাখিরই অ্যারেঞ্জ করা।

তনুশ্রীকে দেখার সঙ্গে-সঙ্গে খুবই কাঁচা অভিনয় শুরু করে দিয়েছিল রাখি, "এ কী তুমি! কী কিনবে গো? তুমি আসবে জানলে, আমরা একসঙ্গেই আসতে পারতাম।"

রাখির কথার মাঝেই তনুশ্রীর সঙ্গে সৌজন্যের হাসি বিনিময় হয়েছিল কুশলের। তনুশ্রীর পরনে ছিল চুড়িদার কুর্তা। আগের দিনের তুলনায় বেশ কমবয়সি লাগছিল। শুধুমাত্র একটা ওড়না কিনল তনুশ্রী। কেনার অজুহাত হলে যা হয়। তারপর প্রায় দেড়ঘণ্টা ধরে তনুশ্রী আর রাখিই পছন্দ করে কেনাকাটা করে গেল বিভিন্ন দোকানে। বাড়ির কার কী লাগবে, কীরকম পছন্দ, রাখি সব জানে। কুশল শুধু টাকা দিয়ে গিয়েছিল।

মাঝে একবার ফোন এসেছিল বাবার। বড়মামা কেমন আছে জানতে চাইল।

কুশল বলেছিল, "এখন অনেকটা স্টেডি। নার্সিং হোমে দিতে হবে না।" কুশল কবে ফিরবে, সে-ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করল বাবা। অদরকারে কুশল মামাবাড়ি বেশিদিন থাকুক, বাবা চায় না। এর উপর বাবার আর-একটা চিন্তাও আছে, বীরপাড়ার বাড়ির অবস্থা স্থিতিশীল হলেই মামা-মামিরা কুশলের বিয়ের চেষ্টা করবে। কুশলের বিয়ের ব্যাপারে বাবার সত্যিই কোনও আগ্রহ নেই। বাবার প্রতি যে-শ্রদ্ধা আগে ছিল, তার অনেকটা অংশেই এখন সন্দেহের ধূসর ছায়া। তবু বাবার সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় গলায় আগের মতোই অনুগতের সুর বজায় রেখেছে কুশল।

বড়মামা বাবার ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিলেও, কুশলের মনে একটা কাঁটা খচখচ করছিল। বড়মামার কাছে প্রসঙ্গটা তুলতে সঙ্কোচ হচ্ছিল বলে বড়মামিকে জিজ্ঞেস করে।

গতকাল দুপুরে বড়মামিকে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "মামি, মায়ের কি কোনও প্রেমিক ছিল? যাকে ছেড়ে বাবাকে বিয়ে করতে হয়েছিল। সেই কারণেই মা মনখারাপ করে থাকত কুঁদঘাটের বাড়িতে।"

বড়মামি বলেছিল, "একথা কে তোকে বুঝিয়েছে? তোর বাবা?"

"না, বাবা কিছু বলেনি। মা যে দুঃখকষ্ট পেয়ে আত্মহত্যা করেছে, সে তো কাল আমি বড়মামার কাছ থেকে জানলাম। মায়ের চিঠিও দেখেছি। মা বীরপাড়ায় এলে দিব্যি হাসিখুশি থাকত। মনখারাপের কোনও লক্ষণ নেই। তা হলে কি মা এখানে এমন কাউকে ছেড়ে গিয়েছিল..."

কুশলকে কথা শেষ করতে দেয়নি বড়মামি। বলেছিল, "না, সেরকম কেউ ছিল না। থাকলে আমরা ঠিক জানতে পারতাম।"

"তাহলে মায়ের উপর বাবার কেন এত রাগ?"

"তা আমি বলতে পারব না। তোর দিদা হয়তো বলতে পারত। দিদিমার সঙ্গে তোর ঠাকুরমার সই পাতানো ছিল। তোর ঠাকুরমা বেলাকে নিজে পছন্দ করে। তখন এবাড়ির অবস্থা খুবই খারাপ। তোর দাদু, মামারা কেউ রাজি ছিল না অত বড়লোকের বাড়িতে বেলাকে দিতে। তোর দিদিমাই জেদ ধরে ও-বাড়িতে বিয়ে দেয় বেলার। মেয়ে তাই নিজের দুঃখকষ্টের কথা একমাত্র মাকেই জানাত। শাশুড়ি মা সেসব কথা চেপে যেত আমাদের কাছে। কারণ নিজেই যে গোঁ ধরে মেয়েকে পাঠিয়েছে বড়লোকের বাড়ির বউ করে।"

amarboi.com

আগের মতোই অজস্র প্রশ্ন জট পাকিয়ে থাকল কুশলের মাথায়। কুশল ভেবেছিল, রাখির সঙ্গে বিকেলে কেনাকাটা করতে বেরোলে হয়তো মনটা একটু হালকা হবে। বিশেষ লাভ হয়নি।

রাখি যে প্ল্যান করে তনুশ্রীকে ডেকে পাঠিয়েছিল, সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল শপিংয়ের পর। রাখিই খাওয়াদাওয়া করার প্রস্তাবটা দিয়েছিল। বেশ ঝকঝকে একটা রেস্তোরাঁয় নিয়ে গেল রাখি, বয়কে অর্ডার দেওয়ার পর হঠাৎ রাস্তায় কাকে যেন দেখতে পেল, "এই আমি একটু আসছি," বলেই ধাঁ। কুশল বোকার মতো চুপচাপ বসেছিল তনুশ্রীর মুখোমুখি।

তনুশ্রীই শুরু করল কথা, "কিছু বলুন।"

কুশল জোর করে হেসে বলেছিল, "আমি একেবারেই আলাপি লোক নই। কী বলি বলুন তো?"

"আপনি কি খুব লাজুক?" মিটিমিটি হেসে জিজ্ঞেস করেছিল তনুশ্রী।

"বোধহয়।"

হাসি আর সামলাতে পারেনি তনুশ্রী, কাচের চুড়ির মতো ছড়িয়ে দিয়েছিল কাচের টেবিলে। হাসির রেশ কাটিয়ে বলেছিল, "এভাবে চুপচাপ বসে থাকা যায় নাকি! কিছু একটা জিজ্ঞেস করুন আমাকে।"

আকাশপাতাল ভেবে কুশল সেই প্রশ্নটা খুঁজে পায়, যেটা মামাবাড়ি এসে কোনওবারই জানা হয় না।

কুশল জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা, আপনি নিশ্চয়ই বলতে পারবেন, আপনাদের জায়গাটার নাম বীরপাড়া। স্টেশনের নাম দলগাঁও কেন?"

প্রশ্নটা একেবারেই প্রত্যাশিত ছিল না। বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিল তনুশ্রী। তারপর যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বলতে শুরু করে, "বহু বছর আগে এই অঞ্চলে খুব ডাকাতি হত। জমি-বাড়ি ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল বহু বাসিন্দা। সেই সময় কিছু বাইরের লোক এখানে থাকতে আসে। তারাই সাহসের সঙ্গে রুখে দিয়েছিল ডাকাতদের উপদ্রব। সেই থেকে এই জায়গার নাম বীরপাড়া। তথ্যটা কতটা ঐতিহাসিক সত্য, তা অবশ্য বলতে পারব না। আর স্টেশনের নাম দলগাঁও হওয়ার কারণ, যে-সময় রেললাইন পাতা হচ্ছিল এই অঞ্চলে, কী মনে করে রেলের কর্তারা জঙ্গলের নামে জায়গার নামকরণ করে দেয়। এখান থেকেই শুরু হচ্ছে দলগাঁও রেঞ্জ। দলগাঁও টি-এস্টেটও এখানে।"

তনুশ্রীর বক্তব্য মুগ্ধ হয়ে শুনছিল কুশল। কী সুন্দর গুছিয়ে কথা বলে মেয়েটা!

প্রশংসাসূচক কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কুশল, তনুশ্রী ফের বলে উঠেছিল, "ব্যস, আমার থেকে এইটুকুই জানার ছিল?"

উত্তরে নীরবতাকেই শ্রেয় মনে করে কুশল। তখনই খাবার নিয়ে এসেছিল বয়। রাখি ফেরেনি। অসৌজন্য হবে জেনেও কাঁটা-চামচ তুলে খেতে উদ্যত হয় কুশল।

তনুশ্রী সামান্য অসহিষ্ণু গলায় বলে, "আমারও তো আপনার থেকে কিছু জানার থাকতে পারে।"

কথাটা ধরতে না পেরে তনুশ্রীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল কুশল, লজ্জায় থমকে থাকা জিজ্ঞাসাটা ওর দৃষ্টি থেকেই পড়ে নেয়।

কাঁটা-চামচ নামিয়ে কুশল বলেছিল, "আপনাকে আমার কেমন লেগেছে, সেটা জানতে চাইছেন তো? খুবই ভাল লেগেছে। কিন্তু এত কম সময়ের ভাল লাগার উপর কি সারা জীবনের বাজি ধরা যায়? এইটুকু সময় আমরা দু'জনেই নিজেদের ভাল লাগানোর জন্য চেষ্টা করেছি।"

"আপনি করেননি," কেটে-কেটে বলেছিল তনুশ্রী।

"মানলাম, আমি করিনি। তবে এক্ষেত্রে মানুষ এরকমই করে থাকে। বিয়ের মতো এত ভাইটাল বিষয়ে এত দ্রুত ডিসিশন নেওয়াটা আমার কেমন যেন অবাস্তব লাগে।"

"আপনি তাহলে লাভ ম্যারেজকেই আইডিয়াল মনে করেন?"

"না, তা-ও ঠিক নয়। দু'জন মানুষ পাশাপাশি অনেকদিন ধরে আছে, তারা পরস্পরকে হয়তো বিশেষ ভালওবাসে না। কিন্তু তারা একদিন উপলব্ধি করল, তাদের এই কাছাকাছি থাকাটা চিরস্থায়ী করা দরকার। কেননা সেটা অনিবার্য। এই উপলব্ধিতে পৌঁছলেই মানুষের বিয়ে করা উচিত।"

একটু ভেবে তনুশ্রী বলেছিল, "বিয়ে তো একটা কাগুজে ব্যাপার। আপনি ওটাকে অত গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন? ধরুন পাশাপাশি থাকা শুরু হল কাগজে সই করে। তারপর যদি একে অপরকে অনিবার্য না মনে হয়, বেরিয়ে আসার রাস্তা তো রয়েইছে।"

"আসলে, বিয়ের ব্যাপারে আমার একটা সংশয় আছে। আমার তখন ক্লাস সিক্স, মা আত্মহত্যা করেছিল। কেন করেছিল, তার কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ আমার হাতে নেই। আজও খুঁজে পাইনি। এক বউ ও বাড়িতে মারা গিয়েছে, আমি কোন সাহসে আর-একজন মেয়েকে ওই বাড়িতে বিয়ে করে তুলি? বাবা অবশ্য বলেছে, ফ্ল্যাট কিনে অন্যত্র থাকতে। নিজের স্বার্থে বুড়ো বাবাকে ফেলে রেখে যাওয়া কি ঠিক হবে?"

কথা বলতে-বলতে কুশল বুঝতে পারছিল, তনুশ্রীর মুখের অভিব্যক্তি বদলে যাচ্ছে। হতভম্ব ভাবটা কিছুতেই লুকোতে পারেনি সে। সেই সময় ফিরে এসেছিল রাখি। ভাব জমে ওঠেনি দেখে, প্রথমে অবাক, পরে হতাশ হয়েছিল।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে তনুশ্রী আর রাখি উঠল একটা রিকশায়, অন্য রিকশায় কুশল একা। তনুশ্রীদের বাড়ির গেটে রাখি অপেক্ষা করছিল কুশলের জন্য।

রিকশা সেখানে পৌঁছতেই রাখি বলেছিল, "নেমে এসো। কথা আছে।"

রিকশা ছেড়ে দিয়েছিল কুশল। দাদা আর বোন হেঁটে এসেছিল বাকি রাস্তা।

রাখি প্রথমেই জিজ্ঞেস করে, "তুমি কী বলেছ তনুশ্রীদিকে? সারা রাস্তা কাঁদতে কাঁদতে এল। যত বলি কাঁদছ কেন, কোনও উত্তর দেয় না। কী বলেছ তুমি ওকে?"

"কান্নাকাটি করার মতো তো কিছু বলিনি!" সত্যি-সত্যি অবাক হয়ে বলেছিল কুশল।

রাখি বলেছিল, "আচ্ছা, তুমি কী বলেছ একবার শুনি, তাহলেই বুঝতে পারব কেন কাঁদছিল।"

সর্তক হয়েছিল কুশল। রাখি কথাগুলো জানলে, মামাবাড়িতে রাষ্ট্র হতে সময় লাগবে না। মা আত্মহত্যা করেছিল, একথা রাখিই হয়তো প্রথমবার জানবে। ঝোঁকের বশে তনুশ্রীকেও উচিত হয়নি ওসব বলা।

তখনকার মতো রাখির কৌতূহল মেটাতে কুশল বলেছিল, "আমি শুধু বলেছি, আপনি দেখতে এত সুন্দর, ভাল গান করেন, পাত্র হিসেবে আমি আপনার যোগ্য নই। ছোট শহরে আছেন বলে বুঝতে পারছেন না, বড়-বড় শহরে বহু সুযোগ্য পাত্র আপনার অপেক্ষায়। পরে আফশোস হবে আপনার।"

কপালে সজোরে চাপড় মেরে রাখি বলেছিল, "ছিঃ, এই ধরনের কথা কখনও কোনও মেয়েকে বলে! এর মানেই তো হচ্ছে, তোমাকে আমার পছন্দ হয়নি। ভদ্রভাবে সেটা বলে দেওয়া হল আর কী! এরপরও সে কাঁদবে না! তোমার যদি এতই অপছন্দ ছিল, তুমি মুখের উপর বলতে গেলে কেন? আমাদের বললেই সমস্যা মিটে যেত।"

কুশল কোনও তর্কে যায়নি। রাখি নিজের মতো যা বুঝেছে, সেটাই ভাল। একথা যদি বাড়ির বড়দের জানায়, কুশলেরই সুবিধে।

বাড়িতে এসে অবশ্য পরিবেশটা বদলে গেল। উপহার পেয়ে সকলেই অত্যন্ত খুশি। কুশলের জন্যও একটা টি-শার্ট ছিল প্যাকেটের মধ্যে। কখন কিনেছে, কে জানে! শপিং-এর সময় তনুশ্রী ছিল। একথা বাড়ির লোকের কাছে চেপে গেল রাখি। রেস্তোরাঁয় খাওয়ার কথাও বলল, কিন্তু মুখ ফসকেও তনুশ্রীর নাম বেরলো না। মনে-মনে নিশ্চিন্ত বোধ করলেও, তনুশ্রীর জন্য খারাপ লাগছিল কুশলের। মেয়েটা তার কাছে অন্য কিছু শোনার প্রতীক্ষায় ছিল। তার প্রত্যাশা তৈরি করেছিল দুই বাড়ির লোক। সে নিজে প্রত্যাখাত না হলেও, এক ধরনের অপমান তো সহ্য করতে হল তাকে। বেচারি বাধ্য হয়ে কুশলের কাছে জানতে চেয়েছিল, তাকে পছন্দ হয়েছে কি না? এই অপমান তো মেয়েটির প্রাপ্য নয়।

কুশল অপেক্ষা করছিল, কখন তাকে বড়মামা ডেকে বলবে, "তনুশ্রীর ব্যাপারে কী ভাবলি?"

উত্তর তৈরিই করে রেখেছিল কুশল। "মায়ের ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝে ওঠা না পর্যন্ত বিয়ের ব্যাপারে আমি কিছু ভাবতে পারছি না। তুমি ওদের ঝুলিয়ে রেখো না।"

মামা কিন্তু কথাটা তুলছিলই না। সন্ধের পর মামার পাশে-পাশে ছিল কুশল। একসঙ্গে টিভি দেখেছে। এটা সেটা নানা গল্প-আড্ডা হল। বড়মামা হয়তো চাইছিল কুশল নিজেই কথাটা তুলুক।

রাতে খেতে বসে কুশল সকলকে শুনিয়ে বড়মামাকে বলেছিল, "ভাবছি কাল কলকাতার ফ্লাইট ধরে নেব। অফিসে প্রচুর কাজ পড়ে আছে।"

খেতে-খেতে মুখ তুলেছিল বড়মামা। বলেছিল, "এত তাড়াতাড়ি যাবি কেন? অফিস থেকে ফোন এসেছিল?"

"না, তা আসেনি। কাজগুলো তো পরে গিয়ে সেই আমাকেই করতে হবে। ট্রেনের রিজার্ভেশন তো সাতদিনের আগে পাব বলে মনে হয় না।"

"আর্জেন্ট যখন নয়, ফালতু অত টাকা দিয়ে প্লেনে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। ট্রেনের রিজার্ভেশন তুই কালকের না হলেও, পরশুর পেয়ে যাবি। বীরপাড়ার কোটা আছে, তোর ছোটমামা ব্যবস্থা করে দেবে।"

সঙ্গে-সঙ্গে বড়মামি ছোটমামাকে বলল, "ছোট ঠাকুরপো, ওর জন্য কালকের টিকিট কেটো না গো। আর একটা দিন অন্তত এখানে থাক।"

এরপরও তনুশ্রীর সম্বন্ধে কেউ কিছু জানতে চায়নি।

পল্টু প্রস্তাব দিয়েছিল, "তরশু গেলে হয় না? পরশু তো রোববার, ভেবেছিলাম একটু গাড়ি ভাড়া করে বাড়ির সবাই মিলে ডিমডিমার ধারে ফিস্ট করতে যাব।"

"হ্যাঁ, চলো। চলো না, প্লিজ়," বলে লাফিয়ে উঠেছিল বাবলু, রাখি।

মামিরাও বলল, "চল না রে। একটা দিন বেশি ছুটি নিলে তোর চাকরি যাবে না।"

মুখের খাবার শেষ করতে-করতে মাথা নেড়েছিল কুশল। বলেছিল, "না গো, সোমবার পৌঁছেই অফিস ঢুকতে হবে। সেদিন ডুব দিলে রোববারটাও কাউন্ট হয়ে যাবে ছুটিতে।"

ডিমডিমা বীরপাড়ার সবচেয়ে কাছের নদী। এখানকার মানুষজন হামেশাই সেখানে চড়ুইভাতি করতে যায়। বর্ষাকালটুকু ছাড়া এখানে সব সময় ভিড়। ছোটবেলায় মামাবাড়ি এসে বেশ কয়েকবার ডিমডিমার ধারে পিকনিকে গিয়েছে কুশল। এবারে ইচ্ছেটা চাগাড় দিয়েও মিলিয়ে গেল। আসলে বাবাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। রাগ, অভিমান কোনও কিছু থেকেই নয়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাবার কাছাকাছি যেতে চাইছে কুশল। এই আকর্ষণটা ঠিক কীরকম, ব্যাখ্যা করতে পারবে না। এছাড়াও চাইছে, দ্রুত তনুশ্রীর নাগালের বাইরে চলে যেতে।

দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে বীরপাড়া দেখতে বেরিয়েছিল কুশল। সেপাইমাঠ পেরিয়ে কলেজের গা দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল নেপালি বস্তির দিকে। ওদিকের জঙ্গলে ঘোর-লাগা এক নেশা আছে। হাঁটতে-হাঁটতে একসময় প্ল্যাটফর্ম ধরে রেললাইন পেরিয়ে গেল কুশল। আগে এদিকটা কত নির্জন ছিল। এখন পরপর ঝুপড়ি। কোলাহল। ছেড়া ফাটা জামা-প্যান্টের অথবা পুরোপুরি উলঙ্গ বাচ্চাদের লাফালাফি। অস্থায়ী বাসস্থানে দেহাতি বউদের প্রত্যয়ী সংসার পালন।

বাসস্ট্যান্ডের কাছে চলে এসেছে কুশল। কতরকম আওয়াজ সেখানে! বাস-অফিস থেকে নানারকম ঘোষণা শোনা যাচ্ছে। কন্ডাক্টর নিজেদের গাড়ির গায়ে চাপড় মেরে চেঁচিয়ে যাচ্ছে, "ধূপগুড়ি, ফালাকাটা, বিন্নাগুড়ি, আলিপুরদুয়ার..."। জায়গাগুলো যেন ডাকছে কুশলকে।

বাজার, বাসস্ট্যান্ড ছাড়িয়ে স্কুলের রাস্তা। বিকেলের আলো মরে এসেছে। ওই তো দেখা যাচ্ছে স্কুলের বাউন্ডারি ওয়াল। পিছন দিকে কোনও পাঁচিল ছিল না, সরাসরি চা-বাগান।

স্কুলগেটের সামনে এসে পড়ল কুশল। খোলাই আছে গেট। কুশল দেখল, বিশাল মাঠ সমেত স্কুলবাড়িটা আগের মতোই আছে। দু'পাশে সারসার কোয়ার্টার। শিক্ষকরা থাকেন। আগে টি-এস্টেট ছিল এটা।

মাঠ ধরে এগোচ্ছিল কুশল, উল্টোদিক থেকে আসছিল মাঝবয়সি একজন লোক, ডান দিকে হাত তুলে কী যেন দেখাল, সম্ভবত হাতিদের ভেঙে দিয়ে যাওয়া জায়গাটা। লোকটা ভেবেছে, কুশল ওটাই দেখতে এসেছে। সেসব দেখার কোনও আগ্রহ নেই কুশলের।

আর একটু এগোতেই চোখে পড়ে দিগন্তলীন চা-বাগানটা। মনে পড়ে পৈতের সময়ের কথা। পৈতেতে একটা নিয়ম আছে, নেড়ামাথায়, গেরুয়া-বসনে, হাতে লাঠি, ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে ব্রহ্মচারী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবে। তিন পা এগনোর পর মা যদি এসে না আটকায়, আজীবনের জন্য সন্ন্যাসী হয়ে যাবে ব্রহ্মচারী। ঘুরতে হবে বনেজঙ্গলে। কুশলের পৈতের আগে মা চলে গিয়েছে পৃথিবী ছেড়ে। মামাবাড়ি থেকে বড়মামা ছাড়া মায়ের গোত্রের আর কেউ আসেনি। কুশলের পিসি, কাকিমা কেউ নেই। বাবা একমাত্র সন্তান। দূরের কয়েকজন আত্মীয় এসেছিল একবেলার জন্য। কুশলের খুব চিন্তা হচ্ছিল, যেসব মাসি, পিসি, কাকিমারা এসেছে, তারা তো খুব আপন নয়, খুব কিছু মায়া নেই কুশলের উপর। কুশল যখন ব্রহ্মচারী বেশে ঘর ছেড়ে বেরোতে যাবে, তারা যদি ভুল করে তিনপায়ের পর না আটকায়! সন্ন্যাসী হতেই হবে কুশলকে। আশঙ্কাটা মাথায় আসলেই মনের চোখে ভেসে উঠত স্কুলের গায়ে চা-বাগানটা। মনে হত, সন্ন্যাসী হলে ওই জঙ্গলেই হারিয়ে যাব। মাঝে-মাঝে দেখতে আসব স্কুলটাকে। জানলা দিয়ে শুনব পড়া।

পড়ন্ত বিকেলে ওই চা-বাগান, পিছনের জঙ্গল, কুয়াশা আজ ভীষণভাবে টানছে কুশলকে। বলছে, চলে এসো। এখন তো তোমার নিজের বলতে কেউ নেই। মা চলে গিয়েছে অনেকদিন আগে। একজন অপরাধী পিতার প্রতি তোমার কোনও কর্তব্য থাকার কথা নয়। আগে 'মনখারাপ'কে ভয় করতে, পাছে পাগল হয়ে যাও। সেই ভয়ও আর নেই। তোমার মায়ের বিষণ্ণতার রোগ ছিল না। তোমার মনখারাপ হবেই বা কেন? জগতের কোনও কিছুর সঙ্গেই তুমি সম্পৃক্ত নও। তোমার কোনও লক্ষ্য নেই। কোনও গন্তব্য ছিল না। তুমি ভীষণ একা। মানবসমাজে অপ্রয়োজনীয়। তোমার জন্য বুক পেতে দাঁড়িয়ে আছে উদার প্রকৃতি। পায়ে পায়ে চা-বাগানের দিকে এগিয়ে যায় কুশল। চোখ বেয়ে জল পড়ছে তার। নিজের জন্য বড্ড কষ্ট হচ্ছে। মনে পড়ছে মায়ের কথা।

একজন লোকের ডাকে হুঁশ ফিরে আসে কুশলের, "ও মশাই, আরে, ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন সন্ধেবেলা? কালই হাতি এসেছিল। চিতাবাঘ তো থাকেই।"

মাথা নিচু করে চা-বাগান থেকে ফিরেছে কুশল। মানুষটার দিকে লজ্জায় তাকায়নি। বোধহয় সেই লোকটাই, স্কুলে ঢোকার সময় যে হাত তুলে হাতির ক্ষয়ক্ষতি দেখাতে চেয়েছিল।

ফের বড়রাস্তার মোড়ে চলে এসেছে কুশল। সিগারেট ধরিয়ে চারপাশটা দেখেছে। আলো ঝলমল বাজার, ব্যস্ত যানচলাচল। বীরপাড়ার এই অংশটুকু বেশ জমজমাট। যে-কোনও মাঝারি শহরের সঙ্গে পাল্লা দেবে।

হঠাৎ কুশলের কানে আসে, "এই যে শুনছেন! এই যে, এখানে!"

ঘাড় ফেরায় কুশল, রিকশায় বসে তনুশ্রী ডাকছে। খুবই বিব্রতবোধ করে কুশল, আড়ষ্ট পায়ে এগিয়ে যায়।

"উঠে আসুন। বাড়িতে যাচ্ছি। আপনিও যাবেন তো?" বলল তনুশ্রী।

সিগারেট ফেলে রিকশায় উঠে বসে কুশল। শরীরের ডান দিকে তনুশ্রীর স্পর্শ টের পায়।

"কোথায় এসেছিলেন এদিকে?"

"ওই, হাতি।"

"সে তো সারা বীরপাড়ার লোকের দেখা হয়ে গিয়েছে। আপনি এত পরে এলেন?"

প্রশ্নটা এড়িয়ে কুশল বলল, "কী আশ্চর্য না! চালসার দিক থেকে তো আগে কখনও হাতি আসেনি।"

"আপনাকে দেখতে এসেছিল। এরকম একজন রেয়ার লোকের আগমনের খবর শুনে ওরা আর থাকতে পারেনি," মুচকি হাসিসহ কথাটা বলল তনুশ্রী। কুশলও বোকার মতো হাসে।

তনুশ্রী ফের বলে, "শুনলাম, কাল ফিরে যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ। রিজার্ভেশন পাওয়া গেলে।"

তারপর দুঃখিত স্বরে বলে, "কাল আমার ব্যবহারের জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত। আপনার সঙ্গে ওভাবে কথা বলা আমার উচিত হয়নি।"

লেভেল ক্রসিং-এর গেট পড়েছে। কয়েকটা গাড়ির পিছনে দাঁড়িয়ে গেল রিকশা।

তনুশ্রী বলে, "কথাগুলো শুনে প্রথমটায় আমি সত্যিই বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। বাড়িতে বসে ভাবলাম আপনার কথাগুলো। আপনি যা বলেছেন, একদম ঠিক। কাউকে দেখে, অল্প কিছু কথা বলেই বিয়ের জন্য নির্বাচন করে ফেলা তো লালসারই নামান্তর।"

কুশল প্রমাদ গোনে, মেয়েটার সর্বনাশ করে দিল সে। সম্বন্ধ করে বিয়েতে তো তনুশ্রী আর রাজিই হবে না! ওর বাবা মা যদি জানে, এসব কুশলের প্ররোচনা, বড়মামাকে ছেড়ে কথা বলবে না।

ট্রেন এসে পড়েছে লাইনে। প্যাসেঞ্জার ট্রেন। হুড়মুড় করে বেরিয়ে যায় কুশলদের সামনে দিয়ে। ট্রেনের আওয়াজে কথা কিছুক্ষণ বন্ধ রইল।

রিকশা চলতে শুরু করলে তনুশ্রী বলল, "তবে মায়ের ব্যাপারটা আপনাকে কিছুটা হলেও ভুলতে হবে। এতটা অবসেসড্ থাকলে আপনারই কষ্ট।"

কুশল যে এটা জানে না, তা নয়। কোনও কিছু ভোলার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আজও আবিষ্কার হয়নি তা-ও জানে। রিকশা বাঁ-হাতি সুভাষপল্লির রাস্তা ধরেছে। ডানদিকে অস্থায়ী ছাউনির চপের দোকান, দূরে দলগাঁওর নতুন স্টেশন চত্বর।

তনুশ্রী বলল, "চপ কিনবেন? আমি বাড়ির জন্য কিনব। এখানকার চপ কিন্তু দারুণ!"

রিকশা দাঁড় করিয়ে চপ কিনল দু'জনে।

রিকশায় উঠে বলল, "আজ কিন্তু আমার সমস্ত ভাল নিয়ে আপনার সামনে হাজির হইনি। আজ আমাকে একটু অন্যরকম লাগছে না? ছটফটে, আজেবাজে খাবারের দিকে ঝোঁক। চপগুলোর বেশির ভাগটাই আমি খাব। বাবা মা অম্বলের ভয়ে খেতে চায় না।"

কুশল কী বলবে! বস্তুত এই তনুশ্রীকেই তার বেশি ভাল লাগছে। প্রশংসা করতেও ভয় লাগছে, যদি কিছু প্রত্যাশা করে বসে মেয়েটা।

তনুশ্রী বলে, "আপনার ফোন নম্বরটা দিন। মাঝে-মাঝে একটু বিরক্ত করব।"

"করবেন," বলে ফোন নম্বর বলতে থাকে কুশল।

তনুশ্রী ওর বাড়ির সামনে নেমে বলল, "ভাড়া দিতে গেলে আপনি নিশ্চয়ই মানা করবেন। তাই গুড নাইট।"

amarboi.com

হাত নেড়ে গেট খুলে ভিতরে চলে গেল তনুশ্রী। মেয়েটা অযথাই কাল চোখের জল অপচয় করেছিল রাখির সামনে।

মামাবাড়ির দালানে চপ-মুড়ি নিয়ে বসেছে সকলে। বড়মামাকে শুধু দেখা যাচ্ছে না। লেজকাটা বেড়ালবাচ্চাটা বাবলুর পাশে বসে দিব্যি মুড়ি-চপ সাঁটাচ্ছে। ছোটমামা কাঞ্চনকন্যার রিজার্ভেশন পেয়েছে। কুশল ভাড়ার টাকাটা দিতে গিয়েছিল, মামা নেয়নি।

আড্ডা চলছে জোরকদমে। বিষয়, বীরপাড়া বনাম কলকাতা। কুশল সঙ্গে পেয়েছে মেজমামিকে। মামির বাপের বাড়ি বেলঘরিয়ায়। মেজমামি একাই একশো। বীরপাড়ার পক্ষকে কোণঠাসা করে ফেলেছে। ওরা বলছিল, কলকাতার লোকেরা কুচুটে। পাশের বাড়িতে ভাল রান্না হলে নাক বন্ধ করে থাকে। ফ্ল্যাটবাড়িতে কেউ মারা গেলে পাশের ঘরের লোকজন বেড়াতে বেরিয়ে যায়।

পাল্টা হিসেবে মেজমামি যা বলল, কুশল তো অবাক! মামির অবজার্ভেশন রীতিমতো আধুনিক। বলল, "তোমরা আর বোলো না, এখানকার আবহাওয়া যেমন নেতানো, মানুষগুলোও তেমন। জোরে হাওয়া বয় না। ঝড় কাকে বলে ভুলেই গিয়েছি। বৃষ্টির কোনও ছাঁট নেই। সোজাসুজি পড়ে যাচ্ছে। এত ক্যাবলা-ক্যাবলা লাগে না।"

বলার ধরনে হাসি সামলাতে পারে না কেউই। মেজমামা শুধু গম্ভীর হয়ে বলে উঠল, "এতই যখন মিয়োনো, ম্যাদামারা জায়গা, তাহলে থেকে গেলে কেন এত বছর?"

"না থেকে উপায় কী! হাতে তো একশো টাকার বেশি হাতখরচ দাও না। কলকাতার টিকিট কাটব কীভাবে?"

রাখি বলে উঠল, "তোমার হাতের বালাটা বেচে চলে যেতে পারতে।"

"তাই কী হয় রে সোনা! মেয়েরা বিনাটিকিটে জার্নি করে হাজতবাস করতে রাজি হবে, কিন্তু গয়না কখনও বেচবে না। তাছাড়া এ গয়না আমার বাপের বাড়ির। ফাঁকা হাত নিয়ে কোন মুখে বাবা, মায়ের সামনে দাঁড়াব!"

মামির কথা পিঠে মেজমামা নিচু গলায় বলে উঠল, "একেবারে সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়েছিল তো মেয়েকে!"

আরও এক পশলা হাসির রোল উঠল। থতমত খেয়ে পিছিয়ে গেল বেড়ালবাচ্চাটা। এরকম নির্মল পরিবেশ থেকে চিরকাল বঞ্চিত থেকে গিয়েছে কুশল। এত আনন্দর মধ্যেও কুশল একটা ব্যাপারে যথেষ্ট শঙ্কিত হয়ে আছে, এই বুঝি কেউ তনুশ্রীর প্রসঙ্গটা তুলল। জানতে চাইবে, পছন্দ হল না কি না।

কথাটা এখনও ওঠেনি। সম্ভবত বড়মামারই আদেশ। বড়মামা কুশলকে ট্রেনে ওঠার আগে পর্যন্ত ভাবার সময় দিয়েছে।

রাখি বলল, "তোমার ফোন। এরকম অদ্ভুত রিংটোন কেন গো?"

ফোনের আওয়াজ শুনতে পায়নি কুশল, বুকপকেট থেকে সেট বের করে দেখে, বাবা।

"হ্যাঁ, বলো?"

"এখনও বাড়িতেই আছ মনে হচ্ছে। ফ্লাইট কি কাল ধরবে?"

"কাল ট্রেনে যাব। কাঞ্চনকন্যা। সোমবার সকালে পৌঁছচ্ছি।"

"ফ্লাইটের টিকিট কি পেলে না?"

"মামারা ট্রেনের টিকিট কেটে দিল।"

"ও," বলে একটু সময় নিল বাবা। তারপর বলল, "আশপাশে হইচইয়ের শব্দ পেলাম, কোনও সেলিব্রেশন?"

"না, সেরকম কিছু নয়। বড়মামার শরীর আজ অনেকটাই ভাল, উঠে বসেছে।"

"গুড নিউজ।"

"ঠিক আছে, এখন রাখছি।"

বাবার সঙ্গে কথোপকথনটা কুশলের নিজের কানেই একটু কড়া ঠেকল। বাবার প্রতি কি ধারণা বদলাচ্ছে তার।

ফোন অফ করে পকেটে পুরে ফেলেছে, তবু মেজমামি চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "কে, ননদাই?"

মাথা উপর-নীচ করে 'হ্যাঁ' বোঝায় কুশল।

চা খেয়ে দালান ছেড়ে উঠে পড়ে কুশল। ছাদে যাবে সিগারেট খেতে। প্যাকেট দেখিয়ে পল্টুকে ডাকে। পল্টু বলে, "আমি এখনই বেরোব। কাজ আছে।"

ছাদে উঠে আসে কুশল। বেশ অন্ধকার। কৃষ্ণপক্ষ চলছে, চাঁদের ফালি একেবারেই সরু। দেশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট ধরায় সে। ফোনের মেসেজ টোন বেজে উঠল। কুশল দেখল লেখা আছে, 'কেমন আছেন আপনার আত্মীয়? নীলা।'

স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে কুশল। একটু বদমাইশি করতে ইচ্ছে হয়। লেখে, 'স্টেব্‌ল। আপনি ফল্‌স নম্বর দিলেন কেন? মোনালিসার সঙ্গে যোগাযোগই করতে পারছি না!'

দেখা যাক কী উত্তর আসে? মজাদার কিছু হবে নিশ্চয়ই।

মেসেজ আসার বদলে ফোন বেজে উঠল। নাম নেই। নীলাই কি? ওর নম্বর সেভ করা নেই কুশলের কাছে। ফোন কানে নিয়ে আস্তে করে "হ্যালো" বলে কুশল।

ওপ্রান্তে ঝনঝন করে ওঠে সেই টিপিক্যাল কণ্ঠস্বর, "অ্যাই শুনুন, আপনি এখন বীরপাড়াতেই আছেন তো?"

"আছি।"

"যেখানে আছেন সেখানকার অ্যাড্রেস দিন। আমি কাল সকালে যাব।"

কুশলের মুখ দিয়ে আপনা থেকেই বেরিয়ে যায়, "কেন?"

"সেটা কি ফোনেই বলতে হবে! কাল গিয়ে বললে চলবে না?"

"না। তা চলবে। তবে..."

"বুঝেছি। আত্মীয়বাড়ি গিয়ে উঠলে নানা প্রশ্ন উঠবে, আমাদের ভাল ছেলেটার এ কী অবস্থা!"

কুশলের এবার একটু রাগই হয়। বলে ওঠে, "না, সে কথা হচ্ছে না। কেন আসছেন জানলে অনেক দিক থেকে সুবিধে হয়। যেমন, কাল বিকেলে আমি ট্রেন ধরছি ফেরার।"

"মনে হচ্ছে, ওর মধ্যেই আমার কাজ হয়ে যাবে। আপনি বাড়ির অ্যাড্রেস দিন অথবা স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকবেন। রিলেটিভের বাড়িতে যদি না নিয়ে যেতে চান, একটা ভদ্রস্থ হোটেলে ঘর বুক করে দেবেন। আমি তো ওখানকার কিছুই চিনি না।"

"আমিও যে খুব চিনি, তা নয়। তবু আসুন। ক'টায় আসছেন?"

"দেখি, সকালের দিকে যে ট্রেন পাব, চলে যাব।"

কুশল বুঝল, এই অস্থিরমতির জন্য প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করার কোনও মানে হয় না। তার চেয়ে বাড়ির ঠিকানা দিয়ে রাখা ভাল। তাই বলল, "ভাল করে শুনে নিন। জায়গাটার নাম বীরপাড়া হলেও, স্টেশনের নাম দলগাঁও। প্ল্যাটফর্মে নেমে রিকশা নেবেন। বলবেন, সুভাষপল্লি যাব। সান্যালবাড়ি।"

"থ্যাঙ্ক ইউ। কাল দেখা হচ্ছে," বলে ফোন কেটে দিল নীলা।

হাতের তালু ঘেমে গিয়েছে কুশলের। রীতিমতো নার্ভাস লাগছে। মেয়েটার পাগলামির পরিচয় সে পেয়েছে। কাল এ-বাড়িতে এসে কী কাণ্ড ঘটাবে, ভগবান জানেন! কাল ভোর থেকে কি প্ল্যাটফর্মেই বসে থাকবে কুশল? মেয়েটাকে ফোন করে আসতে না বলাও যায় না। বেচারি সদ্য ডির্ভোসি, ডিপ্রেশন সামলাতে ফ্যান্টাসির জগতে বাস করে। 'নীলা' নামটাও সত্যিকারের নয়। ট্রেনের আলাপটা এতদূর গড়ানোটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না।

মাথায় চিন্তা নিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছিল কুশল, থমকে যায়। বড়মামা উঠে এল। নির্ঘাত তনুশ্রীর ব্যাপারেই জানতে চাইবে। কুশলের থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে গেল মামা।

একই সঙ্গে হতাশ এবং ক্ষোভের গলায় বলল, "তুই এ কী করলি! বেলা সুইসাইড করেছে, জানিয়ে দিলি তনুশ্রীকে!"

মাথা নিচু করে নেয় কুশল। বড়মামা ফের বলে, "এই এলাকার কেউ জানত না বেলা এভাবে চলে গিয়েছে। সব জানাজানি হয়ে গেল। মুখে চুনকালি পড়ল আমাদের। এ তুই কীসের শোধ নিলি? তোর বাবাকে অমান্য করে, বিয়ের চেষ্টা করছিলাম বলে? বাঃ, একেবারে বাপ কা বেটা!"

কুশল ঢোঁক গিলছে, চেষ্টা করছে বধির হয়ে যাওয়ার। কোনও উপায় নেই।

বড়মামা আবার বলে ওঠে, "তুই কি পাগল হয়ে গিয়েছিস! কীসব উল্টোপাল্টা বলেছিস তনুশ্রীকে, তোদের বাড়িতে নাকি অভিশাপের বাতাস বইছে। বউয়েরা বাঁচে না..."

তনুশ্রী সব বলে দিয়েছে, সমস্তটা। আজ বিকেলে কি মেয়েটা কুশলের সঙ্গে তামাশা করল?

বড়মামার থামার লক্ষণ নেই। "মেয়েটাকে অপছন্দ বা তুই এখনই বিয়ে করবি না, আমাকে বলতেই পারতিস। ওকে এভাবে বলার কী দরকার ছিল! এদিকে মেয়েটা আবার তোকে পছন্দ করে বসে আছে।"

ঠিক শুনল কি না বোঝার জন্য মুখ তোলে কুশল।

বড়মামা চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "পছন্দ মানে তোকে ভাল লেগেছে আর কি! তুই নাকি গভীর মনের মানুষ। তোর সঙ্গে ও যোগাযোগ রাখতে চায়। কিন্তু মেয়ে সম্পর্ক রাখতে চাইলে কী হবে, ওর বাবা মা তো রাজি হবে না। কে আর পাগলের সঙ্গে মেয়েকে ভিড়িয়ে দিতে চায়! তাই ওদের আমি কথা দিয়েছি, তনুশ্রী যোগাযোগের চেষ্টা করলেও, তুই সাড়া দিবি না। আর ওরাও পাঁচকান করবে না বেলার ব্যাপারটা।"

স্বস্তির শ্বাস ফেলে কুশল, বড়মামা সওদাটা গুছিয়েই করেছে। একেই

বলে পাকা সংসারি মাথা।

মামা এবার পায়চারি করতে-করতে বলতে থাকে, "ভুল আমারই, বেলার চিঠিটা দেখানোর পর তোকে একটু সময় দেওয়া উচিত ছিল। আসলে তুই আবার কবে আসবি, ছুটি-টুটি পাবি কিনা, এসব নিয়েই অনিশ্চয়তায় ছিলাম। তাছাড়া বয়সও হয়েছে, সব কিছুতে একটু তাড়াহুড়ো করে ফেলি। পারলে বুড়ো মামাটাকে ক্ষমা করে দিস।"

শেষ কথাটায় স্পষ্ট কান্নার সুর! অবাক হয়ে মামার দিকে তাকায় কুশল, একেই কি বলে স্নেহ?

"কাল চলে যাচ্ছিস। আর ক'টা দিন থাকলে ভাল লাগত। কলকাতার দিকে আর তেমন যাওয়ার দরকার পড়ে না আমার। চেষ্টা করিস মাঝে-মাঝে এখানে আসার। তোর উপর তো আমাদের দাবি কিছু কম নয়। তুই এলি, মনে হচ্ছিল বেলাও কিছুটা এসেছে।"

বড়মামার কথা শেষ হওয়ার খানিকক্ষণ পর মুখ তোলে কুশল, দ্যাখে, নেই। কখন নিঃশব্দে ছাদ থেকে নেমে গিয়েছে।

মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকায় কুশল, একটি তারা নেমে এসেছে খুব নীচে, দেখছে কুশলকে। তারই মতো একলা একটা তারা।

এরকম অদ্ভুত জায়গায় আগে কখনও আসেনি বসুধা। এত কাছাকাছির মধ্যে রাস্তা, মাটির রং পাল্টে যায়! গাছপালা, ফুলের রং খানিকক্ষণ অন্তর আলাদা-আলাদা। এতদূর হেঁটে এল বসুধা, কত রঙের যে ঘাস দেখল, গুনে শেষ করা যাবে না। ঘাসের ধরনটাও অন্যরকম, ভীষণ পিছল। তাই ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটছে না বসুধা, মাটির রাস্তা ধরেই এগোচ্ছে।

শোভাকে খুঁজতে আজ একাই বেরিয়ে পড়েছে বসুধা। এখন মনে হচ্ছে বোকামি হয়েছে। কাউকে সঙ্গে রাখা দরকার ছিল। রাস্তা ঠাহর করা যাচ্ছে না। দূরে পর্বতশ্রেণি, প্রতিটির মাথা সমান। পাহাড় যে এরকম হতে পারে, তার ধারণাই ছিল না। শোভা ওর গ্রামে কোনও পাহাড়ের কথা বলেনি। তাহলে কি ভুল জায়গায় এসে পড়ল বসুধা? উত্তর কে দেবে, ত্রিসীমানায় কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না। বসতির কোনও চিহ্ন নেই। বন-জঙ্গলও চোখে পড়ছে না। একটা রংচঙে আলপনার উপর দিয়ে যেন হেঁটে যাচ্ছে বসুধা। এতটা এসে ফিরে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। যেহেতু সকাল, আলো থাকবে অনেকক্ষণ। আলোটা খুবই মোলায়েম। অদ্ভুত একটা স্নিগ্ধ ভাব। আকাশের দিকে তাকায় বসুধা। সূর্যটাকে খুঁজে পায় না। উষার ফিরোজা আকাশে যেন ডালপালার ছায়া। জায়গাটার সব কিছুই ভারী অদ্ভুত!

আরও অনেকক্ষণ হেঁটে যাওয়ার পর, পাহাড়ের শেষে এসে বসুধা দেখে, এখানে পাহাড়টা হঠাৎই গোল মতো শেপ নিয়েছে, সেই টিলার মাথায় দুটো সরু মিনার। এতই লিকলিকে, হাওয়ায় দুলছে। হয়তো ওই দুটোই শোভাদের গ্রামে যাওয়ার ল্যান্ডমার্ক। টিলায় উঠে এল বসুধা। উঠতে বেশ কষ্ট হয়েছে, পাথর খুবই মসৃণ, কী ক্লান্ত লাগছে, পায়ে-পায়ে এগিয়ে গিয়ে যেই হাত রেখেছে মিনারে, স্প্রিং-এর মতো বসুধাকে নিয়ে নুয়ে পড়ল সেটা। পা শূন্যে ঝুলছে বসুধার, ভয়ে বুক ফাঁকা। শক্ত করে ধরে রাখে মিনারটা। নীচের দিকে তাকায়, এ কী, এ তো অতল খাদ! না, ছোট ছোট বাড়ি-ঘরের ছাদ দেখা যাচ্ছে। ছাদগুলো পিছিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। এই প্রথম বসুধা টের পায় উড়ন্ত কিছুর ওপর সে উঠে পড়েছিল। হাত স্লিপ খাচ্ছে মিনার থেকে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পড়ে যাবে বসুধা। এত রঙিন উড়ন্ত জিনিস কী হতে পারে, যেন আলপনা দেওয়া উপত্যকা। মুহূর্তে প্রজাপতির কথা মাথায় আসে। এতক্ষণ প্রজাপতির ডানার ওপর দিয়ে হাঁটছিল বসুধা, এখন শুঁড় ধরে ঝুলছে। ছেড়ে গেল হাত। চমকে ঘুম ভাঙল।

বালিশের পাশে রাখা মোবাইলের আলো জ্বালিয়ে দেখে নেয় সময়, পাঁচটা দশ। আধঘণ্টার মধ্যে রেডি হতে হবে। ছ'টায় একটা এক্সপ্রেস ট্রেন আছে।

বিছানা থেকে নেমে আসে বসুধা। কাল রাতেই লাগেজ মোটামুটি গুছিয়ে রেখেছে। সকালবেলা স্নানটা সেরে নেবে। সারাদিনে স্নানের সুযোগ হয়তো নাও পেতে পারে।

এরকম বিচিত্র একটা স্বপ্ন কেন দেখল, ভেবে পায় না বসুধা। শেষটা বিচ্ছিরি। গোড়ার দিকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বেশ ভাল ছিল। স্বপ্ন বড় একটা দেখে না বসুধা। অথবা দেখে, সকালে উঠে মনে থাকে না। আজকেরটা পুরোটাই মনে আছে।

বাথরুম থেকে বসুধা বেরিয়ে দ্যাখে, রত্না চা খাচ্ছে। বসুধাকে দেখে টেবিলে রাখা ফ্লাস্ক থেকে মগে চা ঢালল।

বসুধার ঘুম ভাঙার একটু পরেই রত্নাও উঠেছে। চা বানিয়েছে নিজের হাতে। টেবিল থেকে চায়ের কাপ তুলে নেয় বসুধা। চা খেতে-খেতে টুকটাক জিনিসগুলো ব্যাগে ঢোকাতে থাকে। রত্না কোনও কথা বলছে না। জানে, বললে উত্তর পাবে না। কাল রত্না যা-যা বলেছে, তারপর আর ওর সঙ্গে কথা থাকতে পারে না বসুধার। একথা বসুধা জানিয়েও দিয়েছে। রত্না খুব বাজে মেয়ে হয়ে গিয়েছে, নাকি ছিলই? বসুধা ওকে চিনতে পারেনি?

সব কিছু গোছানো হয়ে গিয়েছে। বেরনোর পোশাক পরে নিয়েছে বসুধা, জিন্স আর ঢোলা কুর্তা। হাতে এখনও অনেকটা সময় আছে, ফালতু বসে থেকে তো কোনও লাভ নেই। স্নিকার্সটা পায়ে গলিয়ে হাতে লাগেজ তুলে নেয় বসুধা। রত্না খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে গিয়ে দরজা খোলে। তারপর বারান্দার গ্রিলে লাগানো তালা। 'আসি' বলতেও ইচ্ছে করে না বসুধার, এগিয়ে যায়।

বারান্দা থেকে নামতে গিয়ে দেখা হয়ে গেল কর্নেল মজুমদারের সঙ্গে, রোজকার মতো জল দিচ্ছেন গাছে। বিস্ময়ের গলায় বললেন, "সে কী, চললেন নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"এরকম তো কথা ছিল না, বলেছিলেন ক'টা দিন থাকবেন। ভাল করে তো গল্পই হল না।"

উত্তরে সৌজন্যের হাসি হেসে গেটের দিকে এগোয় বসুধা। পিছনে রত্না আসছে।

কর্নেল মজুমদার আক্ষেপের সুরে বলেন, "এঃ, আগে জানলে ওকে ভোরবেলা তুলে দিতাম। আপনাকে আমার স্ত্রীর খুব পছন্দ হয়েছে। আবার কবে আসছেন?"

গেটের বাইরে চলে গিয়েছিল বসুধা। ঘুরে দাঁড়াল। প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে, বলল, "আপনার গার্ডেনিং-এর শখটা খুব উপকারি। আরও গাছ লাগান, ফুল ফোটান, দেখলে মনটা শুদ্ধ হয়ে উঠবে।"

কথাটা অনুধাবন করতে পারলেন না কর্নেল মজুমদার, অবোধ দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "আপনি এখন রিকশা পাবেন না। স্কুটারটা বের করি, প্লিজ় একটু দাঁড়ান।"

ভদ্রলোক চলে গেলেন বাড়ির পিছনের দিকে। বসুধা তাড়াতাড়ি বিদায় হতে পারলে বাঁচে। অবাধ্য দৃষ্টি চলে যায় বন্ধুর মুখে। ছলছল করছে রত্নার চোখ। বসুধারও গলার কাছে দলা পাকানো কষ্ট। কেন এমন হল? হওয়ার তো কথা নয়।

চোখ নামিয়ে নিতে যাবে বসুধা, রত্না বলে ওঠে, "আর কখনও আসিস না।"

হাত থেকে লাগেজ খসে পড়ে বসুধার, এগিয়ে গিয়ে বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে। দু'জনেই খুব কাঁদে। কান্না ভারী অদ্ভুত জিনিস! কোথায় যে এর উৎস!

হর্ন দিচ্ছেন মজুমদারবাবু। বসুধা সরে এসে ব্যাগ তুলে নেয়। উঠে পড়ে স্কুটারের পিছনে। কর্নেল মজুমদার স্টার্ট দিলেন গাড়ি। বন্ধুকে হাত নাড়ায় না বসুধা, কী করে নাড়াবে, দু'হাতে ব্যাগ সামলাতেই সে এখন ব্যস্ত।

জেনারেল কম্পার্টমেন্ট যথেষ্ট ফাঁকা। জানলার বাইরে আবার সেই অরণ্যশ্রেণি, কখনও বা একটানা চা-বাগান।

গতকাল চা-বাগান নিয়ে অনেক তথ্য দিচ্ছিলেন মজুমদারবাবু। রাত আটটা নাগাদ তিরিক্ষি মেজাজে রত্নার বাড়ি ফিরেছিল বসুধা। শোভার গ্রামে পৌঁছনো যায়নি, তার উপর সুপ্রকাশের ওই নোংরামি।

ঘরে ঢুকতেই রত্না বলেছিল, "কী রে, মুখটা ওরকম করে আছিস কেন? পৌঁছতে পারিসনি গ্রামে? সুপ্রকাশ কোথায় গেল? নেমে গিয়েছে নাকি আগে?"

একটু হলেই ফেটে পড়ত বসুধা, কর্নেল মজুমদার নেমে এসেছিলেন নীচে। বসুধাকে বললেন, "চলুন, উপরে চলুন। ওখানেই চা খাবেন। আমার স্ত্রী আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাইছে।"

ফ্রেশ হয়ে উপরে গিয়েছিল বসুধা। অনেক গল্প হল ওঁদের সঙ্গে। ছেলে আসে না, তবু পুত্র, পুত্রবধূর নামে কত সুখ্যাতি! ওদের না আসতে পারার সাফাই নিজেরাই দিলেন। খুব ভাল চা খাওয়ালেন মজুমদারবাবু। নিজে বানিয়েছিলেন। চা নিয়ে দিলেন দীর্ঘ বক্তৃতা। বললেন, "এখন চা-পাতা তোলার সিজ়ন নয়। বাগানে জল দেওয়ার সময় এটা। ঠিক এই কয়েক মাস ডুয়ার্সে বৃষ্টি হয় না। বছরভর তো লেগেই আছে।"

বসুধা বলেছিল, "আমি যে একটা বাগানে চা-পাতা তুলতে দেখলাম।"

মজুমদারবাবু বললেন, "কিছু বাগানে এখন পাতা তোলা হয়। ওরা স্পেশ্যাল ট্রিটমেন্ট চালায় বাগানে। তবে এখন পাতা খুবই ছোট।"

আড্ডার মাঝেই ফোন করেছিল রত্না, "ওরে নেমে আয়। আর কতক্ষণ গল্প করবি! তোর খিদে পায়নি? খাবার বেড়েছি।"

সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে বসুধা ঠিক করেছিল, সুপ্রকাশের আচরণ নিয়ে কিছুই বলবে না রত্নাকে। কী দরকার ওদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দেওয়ার! রত্না যথেষ্ট ম্যাচিওর, সুপ্রকাশের স্বভাবগতিক ঠিকই বুঝে যাবে। বসুধা এসেছে দু'দিনের জন্য, নিজের কাজে। সেট সফল না হলেও ফিরে

amarboi.com

যাবে। সুপ্রকাশের করা অপমানটা গায়ে না মাখলেই হল। ওরকম ঘটনা বাসে, ট্রেনে মেয়েদের হামেশাই ফেস করতে হয়।

বাড়িতে যখন ঢুকেছিল, বসুধার মেজাজ ছিল চরমে, উপরে ঘণ্টাখানেক আড্ডা মারার পর নিজেকে অনেকটাই বশে নিয়ে আসে। সমস্যা হল নীচে খেতে বসে।

রত্না জিজ্ঞেস করেছিল, "কী ব্যাপার বল তো, সুপ্রকাশকে ফোন করছি, ধরছে না। তোর সঙ্গে খটাখটি কিছু হয়েছে নাকি?"

যতটা সম্ভব মাথা ঠান্ডা রেখে রুটি ছিঁড়তে-ছিঁড়তে বসুধা বলেছিল, "সুপ্রকাশ তোর কে হয়?"

"বলেছি তো, বন্ধু।"

বসুধা বলেছিল, "বন্ধুত্বটা যে গভীর, সে তো আমি কয়েক ঘণ্টাতেই বুঝে গিয়েছি। সুপ্রকাশের বউও নিশ্চয়ই জানে। ওদের মধ্যে অশান্তি হয় নিশ্চয়ই?"

রত্না বিস্ময়ের ভান করে বলেছিল, "আরে, আশ্চর্য ব্যাপার। একজন বিবাহিত লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হতেই পারে। তা নিয়ে যদি বউ অন্যায় অশান্তি করে, সেটা মেনে নিতে হবে!"

"তার মানে তুই স্বীকার করছিস, ওর বউ অশান্তি করে?"

রত্না আত্মপক্ষ সমর্থনে বলেছিল, "বউটার একটু সন্দেহবাতিক আছে।"

"সুপ্রকাশের বউ ঠিকই সন্দেহ করে। তুই যদি আমাকে পারমিশন দিস, আমি তোর ঘর থেকে কন্ডোম বা পিল বের করে দিতে পারি।"

বসুধার কথা শুনে চমকে মাথা তুলেছিল রত্না। মুখে আর্তবিস্ময়। বসুধা বলেছিল, "আমি একদিনে আন্দাজ করতে পারছি, তোদের সম্পর্কটা কতটা ঘনিষ্ঠ, সুপ্রকাশের বউ তো পারবেই।"

"সুপ্রকাশকে আমি ভালবাসি।"

"সুপ্রকাশ কি তোকে ভালবাসে?"

"অবশ্যই। ভালবাসা একতরফা হয় না।"

বসুধা বলে, "ভালবাসা একতরফাও হয়, আর সবক্ষেত্রে তোদের মতো এতদূর গড়ায়ও না। সুপ্রকাশকে তুই সংসার থেকে বেরিয়ে আসতে বল। ওর বউ তো চাকরি করেই, ছেলে-মেয়ে দুটোর জন্য না হয় তোরা প্রতি মাসে টাকা পাঠিয়ে দিস।"

"সুপ্রকাশ ওর ছেলে আর মেয়েকে ভীষণ ভালবাসে, ছেড়ে আসতে পারবে না।"

রত্নার কথার পর গলা চড়িয়েছিল বসুধা, "কীসের ভালবাসে রে? তোকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নিত্য অশান্তি হয়, বাচ্চাগুলো শোনে। দু'জনে কী পরিবেশের মধ্যে বড় হচ্ছে বুঝতে পারছিস?"

একটু সময় নিয়ে রত্না বলেছিল, "সবই বুঝি। কিন্তু আমরা দু'জনেই দু'জনকে ছেড়ে থাকতে পারছি না।"

"পারবি। যখন বুঝবি সুপ্রকাশ তোকে মোটেই ভালবাসে না। স্রেফ ইউজ করে।"

বসুধা শেষ করতেই রত্না বলে, "তুই এতটা শিওর হচ্ছিস কী করে?

"কারণ, তার প্রমাণ আমার কাছে আছে। বাড়িতে বউ, তার উপর প্রেমিকা, তবুও স্কাউন্ড্রেলটার খিদে মেটেনি, আমার সঙ্গে অসভ্যতা করতে এসেছিল।"

বসুধার কথার পর মাথা নিচু করে চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছিল রত্না, কোনও রিঅ্যাকশন দেখায়নি।

বসুধা ফের বলে, "এই ঘটনা তোকে আমি বলব জেনেই, তোর ফোন ধরছে না।"

কথা শেষ হয়েছিল কী হয়নি, ফোন বেজে উঠেছিল রত্নার। আন্দাজ করা যাচ্ছিল সুপ্রকাশেরই কল। রত্না আদিখ্যেতার গলায় ও-প্রান্তের কথা শুনে নিতে-নিতে বলছিল, "বুঝেছি, বুঝেছি।...ঠিক আছে।...কাল সকালে একবার আসছ তো?...না, ওটা অনেক জরুরি...আচ্ছা, শুভরাত্রি।"

বসুধা হাঁ করে তাকিয়েছিল বন্ধুর দিকে। রত্না ফোন অফ করতেই বলেছিল, "এতসব শুনেও ওর সঙ্গে হেসে-হেসে কথা বললি! আসতে বললি বাড়িতে! এবং কাল আমি থাকব, ওকে সহ্য করতে হবে?"

খাবার কিছুটা ফেলে রেখে উঠে গিয়েছিল রত্না। বেসিনে গিয়ে মুখ ধুলো অনেকক্ষণ ধরে। টাওয়েলে হাত-মুখ মুছতে মুছতে বলেছিল, "আমি এতক্ষণ তোকে যা বললাম, সব ঢং। ভালবাসা-টাসা আমি বিশ্বাস করি না। সেক্স ব্যাপারটায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, সুপ্রকাশের সঙ্গে আমার বোঝাপড়া ভাল, ওতেই আমি খুশি। সুপ্রকাশের বউ জানে না আমাদের রিলেশনটা বিছানা পর্যন্ত গড়িয়েছে। ও জানে, আমি একা এখানে এসে আছি। কলিগ হিসেবে সুপ্রকাশ আমার দেখাশোনা করে। আমাকে বাড়িতে বোন বলে পরিচয় দেয় সুপ্রকাশ। আমার ফ্ল্যাটে যে ও এতক্ষণ থাকে, বাড়িতে সেটা লুকিয়ে যায়। বউয়ের সঙ্গে ভালই সম্পর্ক ওর। ছেলে মেয়ের সামনে কিংবা পিছনে কখনওই ওরা ঝগড়া করে না।"

"তা বলে, তুই বউটাকে এভাবে ঠকাবি?"

"এতে তুই ঠকানোর কী দেখলি? আমি সুপ্রকাশকে জোর করিনি। এক্সট্রা-ম্যারিট্যাল রিলেশন নিয়ে কত সংসারে ফাটাফাটি হয়। সেটাও হতে দিচ্ছি না। এত অসুবিধেটা কোথায় বুঝতে পারছি না।"

"তোর লাইফ থেকে সুপ্রকাশ যদি কখনও চলে যায়, কী করবি?"

রত্না সপাটে বলেছিল, "অন্য কাউকে বেছে নেব। যার মধ্যে ভালবাসাবাসির ন্যাকামি থাকবে না। কারও সংসার ভাঙতে যাব না। কাউকে হার্ট করব না। যতদিন সেক্স-এর স্বাদ পাইনি, জানতাম না ব্যাপারটা এত ইন্টারেস্টিং। নাও আই অ্যাম ইনটক্সিকেটেড।"

"তুই ভীষণ নোংরা হয়ে গেছিস। জঘন্য, বাজে মেয়ে।"

"আমি নিজের কাছে সৎ আছি। হিপোক্রিট নই। তবে তোর সঙ্গে সুপ্রকাশ যে-আচরণ করেছে, তার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত। তুই যখন চাইছিস, তোর উপস্থিতিতে সুপ্রকাশ এ-বাড়িতে না আসুক, আমি সেটা এখনই বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।"

বসুধা বলেছিল, "আমি কাল সকালেই চলে যাব।"

সেই শেষ কথা রত্নার সঙ্গে। রত্না কোনও পীড়াপীড়িও করেনি। তাও চলে আসার সময় কেন যে কাঁদল!

এক্সপ্রেস হওয়া সত্ত্বেও অনেক স্টেশনেই ট্রেন থামছে। প্রতিটি প্ল্যাটফর্ম খুব সুন্দর। একেবারে ছবির মতো। আশপাশে প্রচুর গাছ, চা-বাগান তো চলেইছে। প্রজাপতির স্বপ্নটা কি এসব থেকেই উঠে এসেছিল!

তুলনামূলক বড় কোনও স্টেশনে ঢুকছে ট্রেন। অনেক প্যাসেঞ্জার উঠে দাঁড়িয়েছে নামবে বলে। জানলায় মাথা ঠেকিয়ে বসুধা দেখতে পায় প্ল্যাটফর্মের বোর্ডে দলগাঁও লেখা।

ট্রেন থেকে নেমে কয়েক পা এগোতেই বসুধা দেখে, কুশল দূরে দাঁড়িয়ে আছে। বসুধাকে দেখতে পায়নি। প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে খুঁজছে। কুশলের পরনে সাদা পাজামা, পাঞ্জাবি।

এতক্ষণে চোখাচোখি হল। কুশল হাসছে। গালে ক'দিনের না-কামানো দাড়ি। বেশ সস্ত-সস্ত লাগছে। এই চেহারার আড়ালে সুপ্রকাশ, অনুপমের মতো কেউ নেই তো? না, নেই। ওর সঙ্গে ট্রেনে অনেকক্ষণ কাটিয়েছে বসুধা। সে নিশ্চিত।

কুশলের হাসির উত্তর দেয়নি বসুধা। সামনে এসে হাসল।

কুশল বলল, "আমি ভাবলাম, আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না। দেখতে পেয়েও যা গম্ভীর ছিলেন!"

বসুধা জানতে চায়, "হোটেলটা ভাল তো?"

প্রশ্নটা ধরতে একটু সময় লাগে কুশলের। তারপর বলে, "না না, আপনি আমার মামার বাড়িতেই থাকবেন। কাল অবশ্য বাড়ির লোককে আপনার আসার কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। আসবার সময় বলে এলাম বন্ধু আসছে। বান্ধবী বলা উচিত ছিল। খুবই চমকাবে আপনাকে দেখে।"

"কেস তো তাহলে জমে যাবে মনে হচ্ছে," বলে নিজেই হেসে ফেলে বসুধা।

কুশল বসুধার হাত থেকে লাগেজটা নিয়ে বলে, "দেখা যাক। সব আপনার উপরই নির্ভর করছে।"

"একথা বলছেন কেন?"

কুশল ব্যাগ কাঁধে এগিয়ে যেতে-যেতে বলে, "ভীষণ লক্ষ্মীমেয়ে তো আপনি!"

এবার একসঙ্গে হেসে ওঠে দু'জনে। বীরপাড়ার সকালকে হঠাৎই যেন ছুঁয়ে যায় ঝলমলে আলো।

যতটা জমবে আশা করা গিয়েছিল, তেমনটা হয়নি। তবে বিস্তর হোঁচট খেতে হয়েছে। নীলাকে নিয়ে মামাবাড়ি ঢুকতেই সকলে বিষম কৌতূহল নিয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। কুশল প্রথমে বড়মামার সঙ্গে আলাপ করায়। নীলা হাতজোড় করে নমস্কার জানায়। বড়মামা কপাল কুঁচকে একটা হাত বুকের কাছে তুলে সেটা কোনওমতে গ্রহণ করে।

বড়মামার প্রশ্ন করে, "ওই একটাই নাম?"

"না, আর একটা আছে, বসুধা। বসুধা রায়," বলেছিল নীলা।

"রায় তো অনেক ধরনের হয়। তোমরা কি ব্রাহ্মণ?"

"না। তবে আমরা ঠিক কী, তাও বলতে পারব না। বাবা মা বলে বটে, আমি মনে রাখতে পারি না।"

নীলার কথার পর মামা জানতে চায়, "তোমরা ক' ভাইবোন?"

প্রশ্ন শোনার পর হঠাৎ হুঁশ ফিরল নীলার, বলে, "এই রে, আপনি আবার কুশলের সঙ্গে আমার সেইসব সম্পর্কের কথা ভাবছেন না তো? আমরা কিন্তু শুধুই বন্ধু।"

হকচকিয়ে গিয়েও সামলে নিয়েছিল বড়মামা। বলেছিল, "বন্ধুত্বটা কোথায় হল? কলেজে-টলেজে নয় নিশ্চয়ই, তুমি তো কুশলের থেকে বেশ খানিকটা ছোট।"

নীলাকে জলমিষ্টি এনে দিয়েছিল বড়মামি।

বড়মামার প্রশ্নের উত্তরে বলল, "ট্রেনে আলাপ, এইবারই। আলিপুরদুয়ার যাচ্ছিলাম বন্ধুর কাছে।"

কথাটা ঠিক সম্পূর্ণ হল না দেখে, বড়মামা বলেছিল, "তারপর?"

নীলা তখন যা বলতে থাকে, কুশলের কাছে সবটাই নতুন। বলেছিল, "আমাদের বাড়িতে একটা মেয়ে কাজ করত, শোভা। এখানে লোহানিপাড়ায় ওর দেশের বাড়ি। বিয়ের দেখাশোনার জন্য বাড়ি থেকে ওকে ডেকে পাঠায়। শোভা চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, বিয়ে পাকা হয়ে গিয়েছে। কোনও সাহায্য চায়নি। কিন্তু আমাদের বাড়িতে টানা দশবছর কাজ করেছে, কিছু তো দেওয়া উচিত। আলিপুরদুয়ার থেকে ওদের গ্রামে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম, পৌঁছতে পারিনি। এখান থেকে নাকি কাছে।"

বড়মামা বলল, "একেবারেই কাছে। গাড়িতে আধঘণ্টাও লাগবে না। তোমরা জলখাবার খেয়ে নাও। গাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমি।"

বড়মামা বেরিয়ে গিয়েছিল। বাড়ির মেয়েরা ঘিরে রইল নীলাকে। অদম্য কৌতূহলে নানা প্রশ্ন করে যেতে লাগল তারা। কলকাতায় কোথায় থাকা হয়? বাবা কী করেন? তুমি কী করো? ভাই আছে জেনে, জিজ্ঞেস করা হল, ক'বছরের ছোট? কী পড়ে? বাড়ির চারপাশে চোখ বোলাতে-বোলাতে সব প্রশ্নেরই উত্তর দিচ্ছিল নীলা।

মাঝে একবার বলেছিল, "আপনারা কিন্তু পাত্রী দেখার মতো প্রশ্ন করে যাচ্ছেন। বিশ্বাস করুন, কুশলের সঙ্গে আমার সেরকম কোনও সম্পর্ক নেই।"

"বাবা, মা বিয়ের জন্য দেখাশোনা করছে না?" জানতে চেয়েছিল ছোটমামি।

নীলা বলল, "করছে তো বটেই। এখনও পর্যন্ত উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যায়নি।"

"উপযুক্ত মানে?" কূট প্রশ্ন করেছিল রাখি।

"আমার মতো বিচ্ছিরি দেখতে, অব্রাহ্মণ মেয়ের পাশে যাকে মানাবে।"

বাঁকা প্রশ্নের ট্যারা উত্তর পেয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে সরে গিয়েছিল রাখি। ও যে তনুশ্রীর পক্ষে। নীলা বাড়িতে ঢোকার পর থেকেই কপাল কুঁচকে রেখেছিল।

বড়মামি একটা প্রশ্ন করে ফেঁসে যায়। সরলমনে জানতে চেয়েছিল, "তুমি কি বেশির ভাগ সময় প্যান্ট-শার্ট পরো?"

"এখন পরে নিচ্ছি, বিয়ের পর যদি শ্বশুরবাড়িতে না পরতে দেয়।"

খানিক অবজ্ঞায় বড়মামি বলে, "কলকাতায় এখন সবই চলে।"

ভাল মানুষের মতো সহজ ভঙ্গিতে নীলা বলেছিল, "বীরপাড়ায় তো চলে না। পাত্রের মামাবাড়ি যদি বীরপাড়ায় হয়!"

রীতিমতো ভয় পাওয়া দৃষ্টি নিয়ে বড়মামি তাকিয়েছিল কুশলের দিকে। কুশলও বুঝতে পারছিল না, কী বলবে। চোখ সরিয়ে নিয়েছিল। কোনও মেয়ে যে এত ফিচেল হতে পারে, এবাড়ির মানুষগুলোর সে ধারণাটাই নেই।

চা-জলখাবার খেয়ে, লেজকাটা বেড়ালটার সঙ্গে কিছুক্ষণ আহ্লাদ করার পর নীলা ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল লোহানিপাড়ায় যাওয়ার জন্য।

খানিক বাদেই গাড়ি নিয়ে ফিরল বড়মামা। বলল, "সবাই আজকাল যা দর হাঁকছে, ঠিক রেটে গাড়ি পেতে দেরি হয়ে গেল। তোরা আবার কিছু দিতে যাস না, যা ভাড়া দেওয়ার আমি দিয়ে দিয়েছি।"

"এ মা, আপনি দিতে গেলেন কেন?" নীলা বলেছিল।

"তুমি আমাদের অতিথি। আমার ভাগ্নের বন্ধু। আপ্যায়নের সুযোগই তো দিলে না। এইটুকুই না হয় করলাম।"

কিছুক্ষণ গাড়ি চলার পর নীলা বলেছিল, "আপনার মামাবাড়িটা কিন্তু দারুণ! ভাগ্য করে এরকম পাওয়া যায়। ওঁদের মধ্যে কে অসুস্থ ছিলেন?"

"বড়মামা।"

"সে কী, ওঁকে দেখে তো সেরকম কিছু মনে হল না! বাইরে গিয়ে গাড়ি খুঁজে নিয়ে এলেন..."

"উনি অনেকটা আপনারই মতো মিথ্যে খবর দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।"

"এভাবে ডেকে পাঠানোর কারণ?"

"কিছুই না। অনেকদিন দেখেনি তাই।" ইচ্ছে করে সত্যিটা চেপে গেল কুশল, মুখরোচক প্রসঙ্গটা পেলে নীলা খোরাক করতে ছাড়ত না।

কুশলের উত্তর শুনে নীলা বলে, "ভেরি সুইট! নির্দোষ মিথ্যেগুলো কী মিষ্টি হয় বলুন তো!"

কুশল বলেছিল, "এবার আপনি দরকারি সত্যিগুলো বলুন। ট্রেনে বলেছিলেন, আপনি ডিভোর্সি। এখন শুনছি বিয়েই হয়নি। বন্ধুর কাছে বেড়াতে যাচ্ছেন, জানতাম। এখন বলছেন, কাজের মেয়ের খোঁজে। আমার তো সব গুলিয়ে যাচ্ছে।"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান। প্রথমে আমাদের সম্বোধনটা তুমিতে নামাতে হবে। অ্যাট দিস মোমেন্ট আই নিড আ রিয়্যাল ফ্রেন্ড। আই ক্যান রিয়ালাইজ, ইউ আর দ্য রাইট পার্সন।"

এরপর নীলা একে-একে ওর বিয়ে ভাঙার ঘটনা, শোভার কাহিনি পুরোটাই বলেছে। শুনতে-শুনতে কুশলের মনে হয়েছে, মেয়েটা এত সংবেদনশীল বলেই ঠাট্টা, ইয়ার্কির বর্ম পরে থাকে।

ড্রাইভার মনে হয় কোনও শর্টকাট ধরেছে। হাইওয়েতে খুব কম সময় থেকেছে গাড়ি। তারপর সেই যে বেলাকোবা নদীকে ডান পাশে রেখে ভাঙাচোরা রাস্তা ধরেছে, এখনও শেষ হল না। প্রায় গোটা তিনেক গ্রাম পার হয়ে এসেছে কুশলরা। ড্রাইভার নামগুলো বলেছে, দুটো মনে আছে, শিশুবাড়ি, মুজনাই আর একটা নাম মাথায় রেজিস্টার করল না। গ্রামগুলোতে কুড়ি, পঁচিশটা বাড়িও আছে কি না সন্দেহ। আগে যে লোকজন আরও ছিল, চাল উড়ে যাওয়া, ভাঙাচোরা বাড়িগুলো দেখলে অনুমান করা যায়। চাষ-আবাদের কোনও চিহ্ন নেই, বাড়িগুলোর আঙিনায় একটা দুটো ফল বা সব্জির গাছও চোখে পড়ছে না। মাঝে-মাঝে নিদারুণ রসিকতার মতো ভিটে লাগোয়া গাছে গাঁদা, সূর্যমুখী ফুটে আছে। মানুষগুলোর অবস্থা তাদের বাসস্থানের মতোই। বেশির ভাগ পুরুষ খালি গা, মহিলাদের পোশাকের রং একটাই, কাদাটে। বাচ্চাদের অবস্থাও তথৈবচ। শরীরে লেগে আছে পোশাকের সান্ত্বনা। সব হারাতে-হারাতে তারা কৌতূহলও হারিয়ে ফেলেছে। কুশলদের গাড়ির দিকে ঘুরে তাকায়নি কেউ।

গ্রামগুলো দেখতে-দেখতে বড় করে শ্বাস ফেলেছে নীলা। বলেছে, "সত্যি, মানুষগুলো কীভাবে বেঁচে আছে!"

অনেকক্ষণ ধরে জঙ্গলের মধ্যে চলছে গাড়ি। আলো এতই কম, সকাল দশটা মালুমই হচ্ছে না। সন্ধের বিভ্রম তৈরি হয়েছে।

নীলা বেশ কয়েকবার চালককে জিজ্ঞেস করেছে, "লোহানিপাড়া তুমি চেনো তো?"

প্রতিবারই ড্রাইভার বলেছে চেনে, এসেছে এদিকে। খাউচন নদীর কথা বলাতেও ঘাড় হেলিয়ে সায় দিয়েছে।

নীলা আন্দাজ করছে, দেশের বাড়িতে ফিরে এসেছে শোভা। গ্রামে পৌঁছতে পারলেই দেখা হবে। যত সময় যাচ্ছে, নীলা যেন অধৈর্য হয়ে পড়ছে। কীরকম একটা অস্থির ভাব। জঙ্গল পাতলা হচ্ছে ক্রমশ, ড্রাইভার আঙুল তুলে দেখায়, ওই যে লোহানিপাড়া।

সত্যিই দূরে ফাঁকা মতো জায়গায় কয়েকটি চালাঘরের আদল ধীরে-ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে।

ফেলে আসা তিনটে গ্রামের মতোই লোহানিপাড়া। গোটা দশেক বাড়ি ঘোরা হয়ে গেল, শোভা বড়াইয়ের পরিবারের খোঁজ পাওয়া গেল না। এখানকার বাড়িগুলো রাস্তার থেকে হয় নীচে, নয়তো উপরে। ফলে কুশলদের পরিশ্রম হচ্ছে খুব। লোকগুলো কুশলদের প্রশ্ন ভাল করে শুনছে না, মাঝপথেই হাত নেড়ে দিচ্ছে। অর্থাৎ জানে না। কোথাও একটা সমস্যা হচ্ছে, সেটা উপলব্ধি করেই বোধহয় ড্রাইভার ছেলেটি এগিয়ে এল। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল গাড়ির পাশে।

রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছে কুশলরা, অল্প দূরে উঁচু চাতালে বসে আছে ভেঙেচুরে দ হয়ে যাওয়া খালি গায়ে এক বুড়ো।

ড্রাইভার বলল, "ওকে জিজ্ঞেস করুন। পুরনো লোক তো।"

তিনজনেই চড়াই ভেঙে উঠে আসে ওপরে। বুড়ো ভুরুর উপর হাত রেখে মুখ তুলে দেখে কুশলদের।

একটু ঝুঁকে কুশল জানতে চায়, "এখানে বড়াইদের বাড়ি কোথায়?"

বুড়ো কথাটা বুঝল বলে মনে হল না।

কুশল ফের বলে, "বড়াই টাইটেল, পদবি। কোনও বাড়ি আছে?"

বুড়ো কাঁপা-কাঁপা হাতে চারটে আঙুল তোলে। তারপর বুড়ো আঙুল দেখায়। কুশল কিছুই বোঝে না।

ড্রাইভার বলে ওঠে, "ও বলছে চারটে ফ্যামিলি ছিল। এখন একটাও নেই।"

anarboi.com

মাথার ওপর হাত রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলল নীলা।

চালক ছেলেটি বলল, "দাঁড়ান আমি দেখছি।"

সামনে উবু হয়ে বসে সে বুড়োর সঙ্গে এক দুর্বোধ ভাষায় কথা বলতে লাগল। মাঝপথে একবার মেয়েটির নাম জিজ্ঞেস করল।

"শোভা, শোভা বড়াই। পনেরো বছর বয়সে এই গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় কাজ করতে যায়," উত্তরে নীলা বলে ওঠে।

ড্রাইভার নীলার কথাটাই নিশ্চয়ই রিপিট করছে আঞ্চলিক ভাষায়। বুড়ো শুনতে-শুনতে মাথা নাড়ছে। এবার কিছু বলতে শুরু করল। দূরের একটা বাড়ির দিকে আঙুল তুলেছে।

উঠে দাঁড়াল ড্রইভার। বলল, "দাদু বলছে ওই বাড়িটায় শোভার মা থাকে। শোভাদের পরিবারের অন্য লোকজন বস্তি ছেড়ে চলে গিয়েছে। ওটা শোভার মাসির বাড়ি। ওদের পদবি মিঞ্চ। শোভাকে মনে করতে পারছে দাদু।"

উৎসাহ ভরে নীলার দিকে তাকায় কুশল। কিন্তু তেমন সাড়া পায় না। কুশলের খেয়াল হয়, নীলা এখানে শোভাকেই প্রত্যাশা করেছিল।

চাতাল ছাড়ার আগে বুড়োর দিকে তাকিয়ে হাসে কুশল। মিঞ্চবাড়ি লক্ষ করে এগিয়ে চলেছে তিনজনে।

কুশল ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করে, "তুমি কী ভাষায় কথা বললে বুড়োর সঙ্গে?"

"সাদরি। এখানকার আদিবাসীদের ভাষা।"

"এরা বাংলা, হিন্দি বোঝে না?"

"খুব কম লোক বোঝে। এরা শহরের দিকে বিশেষ যায় না।"

কুশল অবাক হয়, ভাষাও এদের বঞ্চিত করেছে? ও দুটো ভাষা জানলে জীবন চালানো একটু সহজ হত।

মিঞ্চবাড়ির কাছে মাঝবয়সি এক মহিলা বাসন মাজছে। রাবারের নলটা ইটের সাহায্যে কলের মতো সেট করা। কোথা থেকে জল আসছে, কে জানে! এখানে সরকারি জলের ব্যবস্থা আছে বলে তো মনে হয় না।

কুশলরা মহিলার কাছে গিয়ে পৌঁছতে, সে চোখ কুঁচকে তাকাল।

এবার ড্রাইভারই এগিয়ে যায়, সাদরি ভাষায় বোঝাতে থাকে কুশলদের প্রয়োজন। মহিলা বিরক্তির সঙ্গে হাত নেড়ে কী যেন বলল।

ড্রাইভার ফিরে এসে বলল, "শোভাকে চেনে না বলছে।"

কুশল একটু ভেবে নিয়ে বলে, "মনে হচ্ছে আমাদের বিশ্বাস করছে না। ভয় পাচ্ছে, যদি কোনও ঝামেলায় জড়িয়ে যায়।"

নীলা ছেলেটিকে নির্দেশ দিল, "ওকে বলো, শোভা আমাদের বাড়িতে কাজ করত। মাইনে না নিয়ে হঠাৎ কাজ ছেড়ে চলে যায়। কোথায় গিয়েছে আমরা জানি না। ওর টাকাটা দিতে এসেছি।"

ড্রাইভার মনে-মনে কথাগুলো একবার আওড়ে নিল। তারপর অনুবাদ করে মহিলাটিকে বোঝাতে লাগল। বলা শেষ হতেই মহিলা ভিতরবাড়ির দিকে মুখ করে হাঁক দিল। কাউকে ডাকল মনে হল। ঘাড় ফিরিয়ে ড্রাইভারকে কী যেন বলল।

সে কুশলদের বলে, "শোভার মা আসছে। এ হচ্ছে শোভার মাসি।"

দরজায় এসে দাঁড়াল মোটাসোটা এক মহিলা। তিন আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে আছে।

নীলা ড্রাইভারকে বলল, "আগে যা বলেছি, একেও তাই বলো। তার সঙ্গে জানতে চাও, যে-কাকার সঙ্গে শোভা কলকাতায় গিয়েছিল, তার নাম কী? ঠিকানা, ফোন নম্বরও নেওয়ার চেষ্টা করবে।"

ড্রাইভারের কথার মাঝেই হাত পাতল মহিলা। মুখে কিছু এখনও বলেনি। ড্রাইভার নীলাকে বলল, "মেয়ের মাইনেটা চাইছে। তার আগে কোনও খবর দেবে বলে মনে হচ্ছে না।"

নীলা পার্স খুলে দুটো পাঁচশো টাকার নোট বের করে মহিলার হাতে দেয়। বিস্ময়ে, উত্তেজনায় মহিলার চোখ বড়-বড় হয়ে গিয়েছে, মুখের পেশি কাঁপছে। হাতে বাসন নিয়ে শোভার মাসি জটলার কাছে এসে দাঁড়াল। শোভার মা নোট দুটো ট্যাঁকে গুঁজে ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলতে থাকে।

সব শুনেটুনে ড্রাইভার নীলাকে বলে, "ঝামেলা আছে।"

"কেন?"

"মেয়েটাকে পাওয়া মুশকিল হবে। ওর মা বলছে, মেয়ে কলকাতায় যাওয়ার পর থেকে কখনও চিঠি বা টাকা কিছুই পাঠায়নি। যে-লোকটা ওকে নিয়ে গিয়েছিল, সে বছরে এক-দু'বার যখন দেশে এসেছে, বলেছে, মেয়ে ভাল আছে। সেই লোকটা অনেক বছর হয়ে গেল আর আসে না। ওদের পরিবারের লোকজনও গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছে।"

"লোকটার নাম জিজ্ঞেস করেছ? কলকাতায় কোথায় থাকত, ওর ফোন নম্বর..."

নীলার কথার মাঝে ড্রাইভার বলে, "লোকটার নাম কৃষ্ণ। কৃষ্ণ লোহার। কলকাতার ঠিকানা বাড়ির কারও কাছে হয়তো ছিল। নিজের লোকেরাই নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। সে ঠিকানা আর পাওয়া যাবে না। ফোন নম্বর লোকটা দেয়নি। লোকটা গ্রামে আসে না অনেক বছর, আর তখন এত মোবাইল ফোনও ছিল না।"

নীলা আকাশের দিকে তাকায়। তাকিয়েই রইল। সব আশা শেষ। নিজেকে ধাতস্থ করে ধীরে-ধীরে মুখ নামায়।

ড্রাইভারকে বলে, "ওকে জিজ্ঞেস করো, এখানে কি এখনও জ্যোৎস্নাপুজো হয়? নদীটা কোনদিকে?"

"নদী আমি জানি। দাঁড়ান পুজোর কথাটা জিজ্ঞেস করি।"

পুজোর ব্যাপারটা এই প্রথম শুনল কুশল, শোভার গল্প বলার সময় নীলা জ্যোৎস্নাপুজোর কথাটা বলেনি।

ড্রাইভার ফিরে এসে জানায়, "জ্যোৎস্নাপুজো একসময় খুব ধুমধাম করে হত, যখন অনেক লোক ছিল গ্রামে। মানুষের হাতে টাকা-পয়সা ছিল। কাজ করত চা-বাগানে। বাগান বন্ধ, লোকজন চলে গিয়েছে। এখন নিয়মরক্ষার মতো হয়।"

কথাটা শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল নীলা। তারপর পার্স খুলে ছোট একটা প্যাড আর পেন বের করল, খসখস করে কী যেন লিখল।

পাতাটা ছিঁড়ে ড্রাইভারকে দিয়ে বলল, "আমার নাম, ফোন নম্বর দিলাম। শোভার কোনও খবর পেলে তখনই যেন আমাকে জানায়।"

চিরকুটটা শোভার মায়ের হাতে দিয়ে নীলার কথাগুলো বলল ড্রাইভার।

নীলা জানতে চায়, "নদীটা এখান থেকে কতদূর?"

ড্রাইভার ছেলেটি আঙুল তুলল কোনাকুনি। বলল, "ওই দিকে। এক কিলোমিটার মতো হবে। গাড়ি পুরোটা যাবে না। বাকিটা হাঁটতে হবে।"

নদীর রাস্তাটা গোল-গোল ছোট-বড় পাথরে ভরা বলে হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে কুশলের। নীলা কিন্তু দিব্যি হেঁটে যাচ্ছে, এগিয়ে গিয়েছে অনেকটা। ড্রাইভার আসেনি, গাড়িতেই আছে।

আরও খানিকটা এগিয়ে নীলা বসে পড়ে বড় একটা পাথরখণ্ডের উপর। সে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। কুশলের দৃশ্যটা ভারী চেনা মনে হয়। যেন এমন পরিবেশে এমন এক নারীকে সে আগে কখনও দেখেছে। এক অদ্ভুত ভাললাগা ঘিরে ধরে কুশলকে। হাঁটতে-হাঁটতে সে নীলার পাশে এসে দাঁড়ায়।

কিছুটা ঢালুর পরই নদী। নীলা বলে ওঠে, "দেখেছ, জলের কী অবস্থা! জ্যোৎস্নাপুজোতে এখানে নাকি প্রদীপ ভাসাত শোভা।"

জল তিরতির করছে। গোড়ালি ডুববে কি না সন্দেহ।

কুশল জিজ্ঞেস করে, "প্রদীপ ভাসানোটা কি?"

"এই নদীর চরে জ্যোৎস্নাপুজো হয় শোভাদের। গ্রামের মেয়েদের পুজো। কোনও মূর্তি নেই, পূর্ণিমার চাঁদকে ধরে নাও দেবতা। নৈবেদ্য সাজিয়ে প্রত্যেক মেয়ে এসে নদীর ধারে রাখে। তারপর সারারাত গান, গল্প, আড্ডা। ভোরের একটু আগে মেয়েরা যে-যার প্রদীপ জ্বালিয়ে ভাসিয়ে দেয় জলে।"

একটু থেমে নীলা কুশলের দিকে মুখ তুলে বলে, "নদী দেখে মনে হচ্ছে না, গল্পটা বানানো? এই জলে প্রদীপ কখনও ভাসে!"

গলা ধরে এল নীলার। তার পিঠে হাত রাখে কুশল। মুখে দু'হাত চাপা দিয়ে কেঁদে ওঠে নীলা।

বেলাকোবা নদী এবার বাঁ পাশে। ফিরছে কুশলরা। আর একটু পরেই হাইওয়ে। হঠাৎ ফোন বেজে উঠল নীলার।

পার্স থেকে ফোন বের করে স্ক্রিন দেখে। বলে, "বাড়ি।"

"হ্যাঁ, বলো। বাবা?"

ও-প্রান্তে কী কথা হচ্ছে বোঝার উপায় নেই, কুশল শুধু লক্ষ করে নীলার মুখ ক্রমশ ভয়, উৎকণ্ঠায় শুকিয়ে যাচ্ছে। একসময় বলে, "চিন্তা কোরো না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরছি।"

কথা শেষ করে গুম হয়ে বসে থাকে নীলা।

গভীর উদ্বেগে কুশল জিজ্ঞেস করে, "কী হয়েছে?"

"মায়ের ভীষণ শরীর খারাপ। আমায় এখনই কলকাতায় ফিরতে হবে। ট্রেনে, বাসে, গাড়িতে, ফ্লাইটে...তুমি কিছু একটা ব্যবস্থা করো।"

এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে আছে কুশল আর নীলা। লাগেজ নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে তারা। এমন সময় কুশলের বাবার ফোন এল।

"বলো বাবা।"

"ফোনে পাচ্ছিলাম না কেন? এখন কোথায়?"

"দমদমে।"

"সে কী! চলে এসেছ। এনিথিং সিরিয়াস?"

"বন্ধুর মা অসুস্থ। এখনই বাড়ি ফিরছি না। রাতে গিয়ে সব বলছি।"

PujaABP B/W F8(Page 117-124=8 Pages)

"ঠিক আছে। সাবধানে থেকো তুমি।"

এয়ারপোর্ট থেকে পাইকপাড়া একঘণ্টার মধ্যে পৌঁছল কুশল। গলি চিনিয়ে বাড়ির সামনে ট্যাক্সি দাঁড় করাল নীলা। দু'জনে নেমে আসে। ভাড়া মেটায় কুশল, নীলা গেট খুলে পৌঁছে যায় বাড়ির দরজায়।

নীলা বেল বাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাশে এসে দাঁড়াল কুশল, লাগেজটাকে বোঝা মনে হচ্ছে এখন। দরজা খুলে যায়, সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ভদ্রমহিলা যে নীলার মা, আন্দাজ করতে অসুবিধে হয় না। চেহারায় কিন্তু মিল নেই দু'জনের। নিজের সন্তানকে বিশেষ এক ধরনের দৃষ্টি নিয়ে দেখে মায়েরা। অল্পবয়সেই কুশল সেটা আবিষ্কার করেছে। ভদ্রমহিলার মধ্যে বাড়তি তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। মেয়েকে দেখেই হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে নিলেন। ছিটকিনি তুলে দিলেন দরজার।

ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "ভাল করেছিস প্লেনে এসে। দু'পয়সা বেশি গিয়েছে যাক, ওরা তো ধরতে পারবে না তুই এখন কোথায়। সারাক্ষণ আমাদের উপর নজর রাখছে, কে কখন কোথায় যাচ্ছে, থাকছে..."

হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন, "যা, ভিতরে গিয়ে বোস। দরজাটা ঠিকঠাক দিলাম কি না দেখে নিই।"

নীলা মাকে বিমূঢ় দৃষ্টিতে ঘুরে দেখল, তারপর এগিয়ে গেল ড্রয়িংরুমের দিকে। বড় সোফাটার কোনায় বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে যিনি বসে রয়েছেন, তিনিই যে বাড়ির কর্তা, বুঝতে পারে কুশল। নীলা তাঁর পাশে গিয়ে বসল না, বসল সোফার আর-এক কোণে। পরিস্থিতি এখনও সে বুঝে উঠতে পারেনি।

কুশল বসল অন্য একটা সোফায়। দরজার কাছে রেখে এসেছে ট্রলিব্যাগটা।

নীলা সংশয়ের গলায় বাবাকে জিজ্ঞেস করে, "কী হয়েছে মায়ের?"

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন নীলার বাবা, মা ফিরে এলেন হন্তদন্ত হয়ে। বললেন, "ওর এখন মাথার ঠিক নেই, গুছিয়ে বলতে পারবে না। আমি বলছি।"

কুশলের উল্টোদিকের সোফায় গিয়ে বসলেন নীলার মা। কুশলের উপস্থিতি খেয়ালই করছেন না।

মেয়েকে বলতে থাকেন, "হয়েছে কী জানিস, তুই বেড়াতে যাওয়ার পর আমার মন আরও খারাপ হয়ে গেল। তোর বাবা দেখেছে, একা-একা বকি, বিয়ের জন্য কেনা তোর শাড়ি-গয়না ঘাঁটি। মিহিরডাক্তারকে বলে তোর বাবা ওষুধ নিয়ে এল। ঘুমটুম হচ্ছিল মোটামুটি। আগের চেয়ে ভাল ছিলাম। হঠাৎ এক দুপুরে অনুপমের ফোন। আমি তখন বাড়িতে একা," থামলেন নীলার মা। দিনটাকে বোধহয় ভাল করে স্মরণ করছেন।

নীলা জানতে চায়, "কী বলল সে?"

"বলল, মেয়েকে জলপাইগুড়ি থেকে তাড়াতাড়ি আনিয়ে নিন। বরযাত্রীসমেত কুড়ি তারিখে বিয়ে করতে আসছি। কোনও ধরনের গড়বড় যেন না হয়। ওপাড়ার লোকজন ডেকে আপনাদের কীর্তি ফাঁস করে দেব। একজনের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করে, অন্য ছেলের কাছে পাচার করেছেন মেয়েকে!"

বড় শ্বাস ছেড়ে হঠাৎ থেমে গেলেন নীলার মা। নীলা জানতে চাইল, "আর কী বলল?"

"আরও অনেক কথাই বলল, ছেলেকে দুর্গাপুর থেকে আনিয়ে নিন। সামনে দিদির বিয়ে, ওখানে বসে কী করছে। এইসময় একা থাকা সেফ নয়। দুর্গাপুরে আমার অনেক চেনা-জানা। আপনার কর্তাকে রাস্তাঘাট দেখে অফিস যেতে বলবেন। আর একান্তই যদি বিয়ে দিতে না চান, লোক লাগিয়ে আপনাদের যা ক্ষতি করার, তা তো আমি করবই। কেন না এটা আমার ফ্যামিলি প্রেস্টিজের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে। মানহানি মামলার চিঠির জন্যও তৈরি থাকুন। কর্তাকে বলুন দশ লাখ জোগাড় করে রাখতে। তুই-ই বল, এতবড় হুমকি একা কখনও সামলাতে পারি? নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়ে গেল আমার। ঘুমটুম সব চুলোর দোরে গেল। ফোন বাজলে, কলিংবেল বাজলে চমকে-চমকে উঠছি। দৌড়ে দরজা-জানলা বন্ধ করছি। তোর বাবা অবশ্য ফোনের লাইন, কলিংবেলের কানেকশন খুলে দিল।"

কথা কেটে নীলা বলে, "কই, বেল তো বাজল। আমি যে ঢোকার আগে টিপলাম।"

"সে তো তোর বাবাকে বলে একটু আগে আমি লাগিয়েছি। এসে গিয়েছিস জানিয়ে যখন ফোন করলি বাবার মোবাইলে, আমি বললাম, এক্ষুনি কানেকশন দাও ডোরবেলের।...তারপর শোন না, আমার ওই অবস্থা দেখে তোর বাবা মিহিরডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে, সাইকায়াট্রিস্ট দেখাল। উনি একগাদা ওষুধ, অনেক উপদেশ দিলেন। কই, কিছু কাজ তো হল না। যাক, তোরা এসে গিয়েছিস। আমার এখন অনেকটাই শান্তি।"

"ভাই ফিরেছে?" জিজ্ঞেস করে নীলা।

মায়ের উত্তরের আগেই টাওয়েলে মাথা মুছতে-মুছতে করিডোর ধরে এগিয়ে এল কুড়ি, বাইশ বছরের এক সদ্য যুবক। খালি গা, পরনে বারমুডা। আন্দাজ করা যায়, স্নান করে বেরলো। হয়তো খানিক আগেই দুর্গাপুর থেকে ফিরেছে। টাওয়েলের আড়ালের জন্য এতক্ষণ কুশলকে দেখতে পায়নি। দেখে একটু থমকাল। কুশল এসে থেকে একটা কথাও বলেনি, বাড়িতে গেস্ট, টের পায়নি ছেলেটা।

নীলা ওর দিকে হাত তুলে কুশলকে বলল, "আমার ভাই, অভিজ্ঞান।"

তারপর কুশলের দিকে ইঙ্গিত করে ভাইকে বলল, "আমার বন্ধু, কুশল।"

অভিজ্ঞান গায়ে টাওয়েল জড়িয়ে এগিয়ে এল হাত মেলাতে।

নীলার মায়ের এতক্ষণে খেয়াল পড়ল, সামনে একজন বাইরের লোক বসে আছে। নীলাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এই সেই ছেলে, যার সঙ্গে পাচার করার কথা বলছে অনুপম? কী অন্যায় বল দিকিনি। আমি তো একে চিনিই না। অথচ বলছে..."

"চুপ করো মা," ঝাঁঝিয়ে ওঠে নীলা।

একটু থতমত খেয়ে নীলার মা এবার সমীহের সঙ্গে কুশলকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি সিভিল ড্রেসে আছেন?"

প্রশ্নের মাথামুন্ডু কিছুই ধরতে পারে না কুশল। নীলা বিরক্তি প্রকাশের আওয়াজ করল শুধু।

অভিজ্ঞান বলল, "মা আপনাকে পুলিশের লোক ভেবে নিয়েছে। গার্ড দিচ্ছেন দিদিকে।"

"ও খুকির বন্ধু," নীলার বাবা বোঝানোর সুরে বললেন স্ত্রীকে। এতক্ষণে ওঁর গলার স্বর শুনল কুশল।

সোফা ছেড়ে উঠে পড়েছেন নীলার মা। "বাঃ, বন্ধু তো ভালই। বিপদে-আপদে বন্ধুরাই তো পাশে থাকে।...যাই, আমি চা-টা করি। মেয়েটা আসার পর থেকে বকেই যাচ্ছি।"

উনি চলে যাওয়ার পর নীলা বাবাকে বলে, "কী ব্যাপার, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। নিজের রোগের কথা নিজেই বলছে!"

সোজা হয়ে বসলেন নীলার বাবা। বললেন, "সাইকায়াট্রিস্টের দেওয়া ওষুধ আমাকে দেখিয়ে খাচ্ছিল। উন্নতি হচ্ছে না দেখে সেই ডাক্তারকে ফোন করলাম। বললেন, মনে হচ্ছে মেডিসিন নিচ্ছেন না, শো করছেন। বাড়ির আনাচকানাচ দেখুন। সত্যিই তাই। কাল আলমারির উপর থেকে একটা কৌটো বের করলাম, দেখি সব ট্যাবলেট রেখে দিয়েছে ওটার ভিতর। একটাও খায়নি। অথচ আমার সামনে ফয়েল খুলেছে, জল মুখে নিয়ে ঢোঁক গিলেছে।"

"তারপর?"

"রিপোর্ট করলাম ডাক্তারকে। বললেন, মেডিসিন না নেওয়ার জন্য কন্ডিশন ক্রিটিকাল হয়ে গিয়েছে। বিয়ের ডেট যত এগিয়ে আসবে, প্রকোপ বাড়বে রোগের। যদি না সিচুয়েশনের বড় কোনও বদল হয়! সবচেয়ে ভাল অ্যাসাইলামে ভর্তি করে দেওয়া!"

"অ্যাসাইলাম!" কথাটা নিঃসহায়ভাবে পুনরুচ্চারণ করে নীলা।

চা-জলখাবার নিয়ে ফিরে এসেছেন নীলার মা, সেন্টার টেবিলে ট্রে রেখে সোফায় গিয়ে বসলেন। অভিজ্ঞান এগিয়ে এল পট থেকে চা ঢেলে দিতে।

নীলার মা বললেন, "তোর বাবাকে বললাম, যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে, বিশ লাখ জোগাড় করে ওদের দিয়ে এসো। ঝামেলা মেটাও। তোর বাবা বলছে, সম্ভব নয়। নিজেকে বিক্রি করেও ওই টাকা জোগাড় হবে না। আমার কথা হচ্ছে, কেন সম্ভব নয়?"

কুশল লক্ষ করে নীলার মায়ের গলার স্বর চড়ছে। বলে যাচ্ছেন, "ছেলে-মেয়েকে আতুপুতু করে মানুষ করার সময় মনে ছিল না! বাইরে মেলামেশা করতে দাওনি। একা-একা কোথাও বেরোয়নি। এরা ভাল, খারাপমানুষ বাছবে কী করে! নীলার জায়গায় যদি অন্য মেয়ে হত, এক দেখাতেই বুঝে যেত অনুপম ছেলেটা কত বড় শয়তান।"

একটানা কথা বলে থামলেন নীলার মা। তারপর হঠাৎ গলা সপ্তমে উঠিয়ে স্বামীর দিকে আঙুল তুলে বলতে লাগলেন, "এই লোকটা! এই লোকটার জন্যই আজ আমাদের এরকম দুর্দশা! উনি শুধু বোঝেন, ভাল, ভদ্র, মার্জিত। এই করে আমরা যে কেঁচো হয়ে গেছি..."

এরপর নীলার মা যা করলেন, কষ্টকল্পনাতেও আনতে পারবে না কুশল। টেবিলে রাখা কাঠের অ্যাশট্রেটা তুলে ছুড়ে মারলেন স্বামীকে। উনি সম্ভবত আঁচ করেছিলেন ঘটনাটা, তাই ধরে নিলেন অ্যাশট্রে।

নীলার মা রীতিমতো ফুঁসছেন।

অভিজ্ঞান এগিয়ে যায় মায়ের কাছে, পিঠে হাত বোলাতে-বোলাতে বলে, "কেন রেগে যাচ্ছ মা। তোমার ব্লাড প্রেশার আছে। চলো, ভিতরে চলো।"

মাকে নিয়ে চলে গেল অভিজ্ঞান। নীলার বাবাও উঠে পড়লেন। ঘরে

amarboi.com

কুশল আর নীলা বসে থাকে স্থির, নির্বাক।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর কুশল বলে, "আমি এবার উঠি।"

"উঠবে!" ক্লান্তস্বরে বলল নীলা।

কুশল উঠে পড়ে সোফা ছেড়ে। বিষাদভার নামিয়ে নীলাও ওঠে, এগিয়ে যায় দরজা খুলে দিতে।

দোরগোড়া থেকে নিজের লাগেজ তুলে কুশল বাইরে যায়।

সুটকেসে চোখ পড়তে, নীলা বলে, "তোমাকে তো ভারী ব্যাগটা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ হাঁটতে হবে। কাছাকাছি ট্যাক্সি পাবে না। দাঁড়াও, ভাইকে ডাকি, ও যাক তোমার সঙ্গে।"

"না না, দরকার নেই। এটা তো ট্রলি, ভাল রাস্তা পেলে গড়িয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে।"

তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে নীলার চোখে সরাসরি তাকিয়ে কুশল বলল, "আমরা কি বিয়ে করতে পারি, এই কুড়ি তারিখে?"

"করুণা করছ?"

"না, অনিবার্যতা। বিয়েটা অনিবার্য ছিলই। তোমার বাড়ির পরিস্থিতি বিচার করে সময়টা একটু এগিয়ে নিয়ে আসতে চাইছি।"

"তোমার বাবা, মা আমায় দেখল না, কোনও কথাবার্তা হল না, এভাবে হয় নাকি!"

"আমার মা অনেকদিন নেই। ছেলের বিয়ের ব্যাপারে বাবা লিস্ট ইন্টারেস্টেড। তাছাড়া আমরা আলাদা ফ্ল্যাটে থাকব।"

"কেন?"

"বাবার তেমনই ইচ্ছে। পুত্রবধূর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে না। মা-ও পারেনি বাবার সংসারে নিজেকে মানাতে। এগারো বছরের আমাকে ছেড়ে মা চলে যায়।...আত্মহত্যা করেছিল।"

একটা কার্ড পার্স থেকে বের করে নীলার হাতে দিয়ে কুশল বলে, "চাকরি ভালই করি। অসুবিধে হবে না সংসার চালাতে। তোমার বাবা মাকে সব কথা জানিয়ো। আসি।"

ট্রলিব্যাগ টেনে গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কুশল। কী অনাড়ম্বর, নিরীহ ওর যাওয়া। বাতাসে নিঃসাড়ে যেভাবে ফুলের সুগন্ধ বয়ে যায়।

দরজা খোলা রেখে ফিরে আসে বসুধা। সুগন্ধটা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ুক।

ডোরবেল বাজল। দেওয়ালঘড়ির দিকে তাকাল শ্রীবাস মুখোপাধ্যায়, আটটা বেজে গিয়েছে। খোকাও ফিরে এসেছে অফিস থেকে। এখন কে এল?

দরজা খুলে দেখেন, বছর চব্বিশ-পঁচিশের একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে।

মেয়েটি জিজ্ঞেস করে, "কুশল আছে?"

অল্পবয়সি মেয়েটা খোকাকে নাম ধরে ডাকছে দেখে কপালে বিরক্তির ভাঁজ পড়ে শ্রীবাসের। বললেন, "আছে। এসো।"

সেই সময়ই কুশল নেমে আসছিল দোতলার সিঁড়ি দিয়ে, নীলাকে দেখে থমকাল। দূর থেকেই বলল, "কী ব্যাপার, তুমি?"

কুশল বাবার কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, "বাবা, এ হচ্ছে নীলা।"

শ্রীবাস একটি সোফায় বসে পত্রিকার পাতা ওলটাতে থাকেন। নীলা আর কুশলও এসে বসে।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কুশল স্পষ্ট স্বরে বলে, "বাবা, আমরা সামনের কুড়ি তারিখে বিয়ে করছি।"

শ্রীবাস চমকালেন না। বয়স অভিজ্ঞতায় তিনি এইরকম কিছু শোনার অপেক্ষাতেই ছিলেন। মেয়েটির আত্মবিশ্বাসী ভাবভঙ্গি তাঁকে সঙ্কেত পাঠাচ্ছিল।

ছেলের উদ্দেশে শান্তস্বরে বললেন, "কুড়ি তারিখ মানে তো হাতে মাত্র পাঁচটা দিন। ফ্ল্যাট পেয়েছ?"

ছুটির পর আজ প্রথম অফিসে গিয়ে তিনটে ফ্ল্যাটের সন্ধান পেয়েছে কুশল, সে কথাই বলতে যাচ্ছিল বাবাকে।

তার আগেই নীলা বলে উঠল, "আমরা এই বাড়িতেই থাকব।"

এটা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না শ্রীবাস, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকালেন। জিজ্ঞাসাটা হচ্ছে, তুমি মেয়েটিকে শর্তটা বলোনি?

খোকার দিক থেকে কোনও উত্তর এল না। সে চোখ সরিয়ে নিয়েছে।

শ্রীবাস বললেন, "তাহলে আমাকেই খুঁজে নিতে হবে আলাদা জায়গা।"

"না, আপনি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন," বলল নীলা।

কথাটা যেন কানেই গেল না শ্রীবাস মুখোপাধ্যায়ের, ঝুঁকে পড়ে পত্রিকার নিবন্ধে মনোযোগ দিলেন।

নীলা কুশলকে বলল, "চলো, বাড়িটা একটু ঘুরে দেখাও।"

উঠে পড়ল দু'জনে। সদয় চা নিয়ে এসেছে।

নীলা বলে, "শুধু চা-বিস্কিটে হবে না। অফিস থেকে ফিরেছি। ভীষণ খিদে পেয়েছে।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আমি আনছি," ব্যস্ত গলায় বলে সদয়।

দু'জনে এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে।

কুশল জিজ্ঞেস করে, "তুমি বাড়ি চিনলে কী করে?"

"গেস করো?"

বাবুর সামনে চা রাখল সদয়। কী যেন বলল। শুনতে পেলেন না শ্রীবাস। তাঁর দৃষ্টি খোলা দরজায়। কোনও কোনও ঝড় এমনই হয়, আচমকাই আছড়ে পড়ে। খুলে দেয় তালাবন্ধ দরজাও।

'ইতি তোমার' শব্দদুটো লিখে একটু থামলেন শ্রীবাস, 'হতভাগ্য' 'ক্ষমার অযোগ্য' অথবা 'সদা মঙ্গল কামনায়' এরকম অনেক কিছুই মাথায় আসছে, লিখলেন না। কথাগুলোর মধ্যে কেমন যেন যাজ্ঞা আছে। কোনও ধরনের অনুকম্পার যোগ্য উনি নন। যেমনটা হওয়ার ছিল, তাই হচ্ছে। এর জন্য তিনিই দায়ী। তাই শুধু 'বাবা' কথাটা লিখে চিঠিটা খামে ভরে খোকার টেবিলে পেপারওয়েট চাপা দিয়ে রেখে দিলেন। ওখানেই জানানো রইল তাঁর বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার কারণ। ছেলে এই ক'দিন বারবার জানতে চেয়েছে, নীলাও কয়েকবার। বেলার চিঠি দেখিয়েছে খোকা। মামাবাড়ি থেকে জোগাড় করেছে। কোনও প্রশ্নের উত্তর শ্রীবাস দেননি। এই চিঠিটাই তাঁর কনফেশন। এরপর যদি ছেলে, ছেলের বউ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে মনে করে, রাখতেই পারে। তাঁর দিক থেকে কোনও প্রত্যাশা নেই। শ্রীবাস চলে যাচ্ছেন বৃদ্ধাবাসে। ঠিকানা দিয়ে গেলেন। আজকের দিনটা বাছার কারণ, বাধা দেওয়ার কেউ নেই। সকলেই খোকার বিয়েতে গিয়েছে। বাড়িতে তালা লাগিয়ে চাবিটা পাশের বাড়ির মল্লিকদের দিয়ে যাবেন। ওদের বলবেন না, কোথায় যাচ্ছেন। সুটকেস গোছানোই আছে, এবার নিজে পোশাক বদলাবেন। আজ আবার বিকেল থেকে মেঘলা করে আছে। এরকমটাই হওয়ার কথা, জীবনের বিশেষ-বিশেষ দিনে এই আবহাওয়াই বরাবর পেয়ে এসেছেন শ্রীবাস। মা মারা যাওয়ার দিন, সৎমাকে নিয়ে বাবার বাড়ি ঢোকার দিনও ছিল এরকম বৃষ্টিমুখর। পুতুল তো বৃষ্টির জন্যই মারা গেল। পুতুল সৎ মায়ের একমাত্র মেয়ে। শ্রীবাসের বোন। পুতুলের মৃত্যুর কারণেই তাঁর আজ এই পরিণাম।

পুতুলকে সাইকেলে চাপিয়ে পিরতলায় মেলা দেখতে গিয়েছিলেন। পুতুল তখন চার, শ্রীবাস দশ। বোনকে খুব ভালবাসতেন। মেলা দেখতে-দেখতে আকাশ কালো করে এল। পুতুলকে সাইকেলের সামনের রডে বসিয়ে জিটি রোড ধরে বাড়ি ফিরছেন, তখন হুগলিতে থাকতেন, বৃষ্টি নামল জোরে। চোখ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল, একটা লরি ধাক্কা মেরেছিল পিছন থেকে। পুতুল বাঁচল না। শ্রীবাস অক্ষত। মা বললেন, পুতুল আপন বোন নয় বলে ইচ্ছে করে মেরেছেন শ্রীবাস। যতদিন বেঁচে ছিলেন, মা একই কথা বলে গিয়েছেন। বাবা প্রতিবাদ করেননি, হয়তো ভাবতেন, এই বলে যদি শোক কিছুটা কমে, কমুক। কান্না দিয়ে শোক ধোওয়া যায় না। দায়ী করতে পারলে কিছুটা প্রলেপ পড়ে। সেই কারণে ভগবানকে দায়ী করে মানুষ। তবে ভগবানকে দিয়ে তো গাধার খাটুনি খাটানো যাবে না। শ্রীবাসকে দিয়ে সেটাই করাতেন তাঁর সৎ মা। অশেষ নির্যাতন করেছেন, অসীম নিগ্রহ।

শ্রীবাস একসময় নিজেই বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন, পুতুলের মৃত্যুর জন্য তিনিই দায়ী। তিনি অপয়া। কারও ভার নেওয়ার যোগ্য নন। সভয়ে সব ধরনের দায়িত্ব এড়িয়ে চলতেন। একমাত্র মায়ের কোনও আদেশে না করতেন না। পুতুলের মৃত্যুর দায়ে সাজা খাটতেন। পাছে কোনও দায়িত্ব এসে পড়ে, এই আশঙ্কায় বাইরের জগৎ এড়িয়ে চলতেন। বন্ধু-বান্ধব প্রায় ছিলই না, মেয়েদের থেকে শতহস্ত দূরে থাকতেন। এই নির্জনতা আর পরিষ্কার মাথার কারণে পড়াশোনায় ভাল ফল হয়েছে, চাকরি পেয়েছেন উঁচুদরের। মায়ের আদেশেই বিয়ে, পাত্রী তাঁর সইয়ের মেয়ে। বিয়ের পরই শ্রীবাস টের পান, জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করেছেন। মায়ের নিগ্রহ তাঁকে যে এতটাই নারীবিমুখ করেছে, তিনি আগে বুঝতে পারেননি। বেলার কোনও কিছুই তাঁর পছন্দ হত না। হাঁটা, চলা, গলার স্বর কিচ্ছু না। একবছর অন্তর প্রথমে বাবা, তারপর সৎ মা চলে গেলেন। মায়ের অন্তর্ধানের সঙ্গে-সঙ্গে নারীবিমুখতা বিদ্বেষে রূপান্তরিত হল। আর কাউকে পুতুলের মৃত্যুর জবাব দিতে হবে না।

বেলাকে খুবই কষ্ট দিয়েছেন, আবার নিজেই বলেছেন বীরপাড়ায় ফিরে যেতে। তবে সে সঙ্গে খোকাকে চায়। কুশল পৃথিবীতে এসেছিল জৈবিক তাড়নায়। এসে যাওয়ার পর শ্রীবাস তার মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেতেন। বউ বাপের বাড়ি ফিরে যাক, সঙ্গে তাঁর খানিকটা অস্তিত্ব নিয়ে যাবে কেন? তাছাড়া ওই গরিব পরিবারে কষ্ট পেয়ে মানুষ হওয়ার ভাগ্য নিয়ে তো সে জন্মায়নি। তার পিতা একজন পদস্থ চাকুরে। ততদিনে হুগলির বাড়ি বিক্রি করে কুঁদঘাটের দোতলা বাড়িতে চলে এসেছেন। কুশলকে ভাল স্কুলে পড়ানোর জন্যই কলকাতায় আসা।

দাম্পত্যের বয়স যত বাড়ছিল, বেলার উপর বিরক্ত হচ্ছিলেন বেশি। ওর শরীরের প্রতিও রুচি চলে গিয়েছিল। তবু বেলা এগিয়ে আসতে চাইত তার সর্বস্ব নিয়ে, শ্রীবাস আঘাত দিয়েছেন বারবার, গায়ে হাত তুলেছেন পর্যন্ত। বেলা বাপের বাড়িতে কোনও ঘটনাই জানায়নি। জানালে ফ্যাসাদে পড়তে পারতেন শ্রীবাস। বেলা শুধু তার মাকে চিঠি লিখত। যার একটা কুশল ক'দিন আগে দেখাল। ছেলের বিয়ের ব্যাপারে শ্রীবাস কখনওই কোনও উদ্যোগ নেননি। ছেলের বউ এলেই তাঁকে আলাদা হয়ে যেতে হবে। কখন কী ব্যবহার করে বসবেন, নিজের উপর বিশ্বাস নেই তাঁর। মেয়েদের বেশিক্ষণ সহ্য হয় না। বাড়ির সব সময়ের কাজের জন্য তাই সদয় থাকে। ঠিকে ঝি আসে একঘণ্টার জন্য।

শ্রীবাস জানতেন, তিনি উদ্যোগ না নিলেও, ছেলের বিয়ে একদিন হবেই। পৃথক থাকতে হবে। এটা অবশ্যম্ভাবী। বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে ভাবেননি। নীলা মেয়েটা বড্ড জেদি, ওর জন্যই উৎখাত হতে হচ্ছে তাঁকে। মাঝের ক'দিন দু'জনকে না জানিয়ে অনেক বৃদ্ধাবাসের খোঁজ নিয়েছেন শ্রীবাস। এদের ব্যবস্থা সবচেয়ে ভাল। ভদ্রেশ্বরে একেবারে গঙ্গার ধারে।

বাইরে বৃষ্টির দাপট বাড়ল। দেরি করা যাবে না। যেতে হবে অনেকটা। ছাতা বের করে রেখেছিলেন শ্রীবাস, সুটকেস, তালা চাবি হাতে নিলেন। বেলা যেদিন মারা যায়, সেদিনও বৃষ্টি হয়েছিল খুব। বৃষ্টি মাথায় খুব দৌড়োদৌড়ি করতে হয়েছিল, পাড়ার লোক, পুলিশ, ডাক্তার...

ছাতা মাথায় সদরে তালা দিচ্ছেন, পিছন থেকে কে যেন ডাকল, "বাবু!"

মহিলাকণ্ঠ। ঘুরে দাঁড়ালেন শ্রীবাস, একটা রোগা, শ্যামলা মেয়ে। বৃষ্টিতে চুপসে গিয়েছে। বয়স তিরিশের কিছুটা কমই হবে। ছাতাও নেই হাতে।

"কী চাই?"

"আমি বসুধাদিদির কাছে এসেছি।"

নীলাকে খুঁজছে, ওর ভাল নাম বসুধা। শ্রীবাস বললেন, "তার তো আজ বিয়ে। কাল আসবে এবাড়ি। তুমি কে, তোমার নাম কী?"

"আমি শোভা। বসুধাদিদি আমাকে ভাল করে চেনেন।"

মেয়েটাকে শ্রীবাসও চিনলেন। একেই ক'দিন ধরে বেদম খুঁজে যাচ্ছে কুশল আর নীলা। এর সমস্ত ঘটনাই শ্রীবাসকে জানিয়েছে তারা। মেয়েটার গায়ে বৃষ্টির ছাঁট আসছে।

শ্রীবাস বন্ধ দরজা ঠেলে বললেন, "ভিতরে এসো।"

শোভা ভিতরে বেশিদূর এগলো না, গা থেকে জল পড়ছে। শ্রীবাসকেও সুটকেস হাতে ফের বাড়িতে ঢুকতে হল।

শোভাকে বললেন, "নীলা তোমার সম্বন্ধে সব কিছু আমায় বলেছে।"

"কে নীলা?" অবাক হয়ে জানতে চায় শোভা, নামটা সে শোনেনি।

"ওই যাকে তুমি বসুধা বলছ।...তুমি এ-বাড়িতে এলে কী করে? এতদিন ছিলে কোথায়?"

"অনুপম একটা ফ্ল্যাটে আটকে রেখেছিল। ছেড়ে দিল আজ। বলল, যা, তোর বসুধাদিদির বাড়ি গিয়ে ওঠ। আপনাদের বাড়ির ঠিকানাটা দিল। হাতে একটা পয়সাও দেয়নি। আমি পায়েহেঁটে এতদূর এলাম।"

সব শুনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকেন শ্রীবাস। ভেবে পাচ্ছেন না কী করণীয়। শোভাকেই জিজ্ঞেস করেন, "এখন কী করবে তুমি?"

"এই বাড়িতেই থাকি। এই চেহারায় তো বিয়েবাড়ি যাওয়া যায় না।"

ভালই সমস্যায় পড়েছেন শ্রীবাস, মেয়েটাকে একলা এ-বাড়ি কী করে ছেড়ে যাবেন? মেয়েটিকে বিয়েবাড়িতে তুলে দিয়ে আসাই ভাল। তারপর ওরা যা পারে করুক। শ্রীবাস চলে যাবেন নিজের গন্তব্যে।

মেয়েটিকে বললেন, "দাঁড়াও, তোমায় শাড়ি দিচ্ছি। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নেবে। বসুধার কাছে পৌঁছে দেব।"

বিয়ের পিঁড়িতে বসে আছে বসুধা। খানিক খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। এখন থেমে গিয়েছে। সানাই বাজছে। বাড়ির ভিতরেই ছাদনাতলা। উল্টো দিকের মাঠে খাওয়াদাওয়া। প্রচুর লোকজন এসেছে। কুশলের মামাবাড়ির সকলে। তারা কেউ কুঁদঘাটের বাড়িতে ওঠেনি, ওদের জন্য আলাদা বাড়িভাড়া করা হয়েছে। বড়মামা খুব মজা করছেন, আনন্দে আছেন। ওঁকে ফোন করে কুশলের বাড়ির ঠিকানা পেয়েছিল বসুধা। লোহানিপাড়া থেকে ফেরার সময় কুশল বড়মামাকে ফোন করে ফ্লাইটের টিকিট করিয়েছিল। বসুধা মামাবাড়ি পৌঁছে ভাত খেয়ে বাগডোগরার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে। বড়মামা তখনই নিজের ফোন নম্বর দিয়ে বলেছিলেন, "আমাকে যদি কখনও দরকার পড়ে ফোন কোরো।"

সবই তো ঠিকঠাক হল, শোভার কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না। মেয়েটা কোথায় যে আছে, কীভাবে আছে? অনুপমকে ফোন করে ওর সম্ভাব্য ঠিকানা জানতে চেয়েছিল বসুধা, যথারীতি পাওয়া যায়নি। ওই ফোনেই বসুধা নিজের বিয়ের ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, "যদি কিছু করার ক্ষমতা থাকে করো।"

তারপর থেকে ওদের দিকে আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। থাকবে না বসুধা জানত, মাকে একা পেয়ে যেমন ইচ্ছে চোটপাট করেছে। মা এখন অনেকটাই ভাল। ওষুধ খাচ্ছে। থম মেরে আছে একটু। আজ তো একটু-আধটু হাসতেও দেখা গেল।

বসুধার মুখ শুকনো দেখে অনেকেই এসে বলেছে, "কী ব্যাপার, হাসি নেই কেন? রাজপুত্রের মতো বর পেলি!"

বরের মুখেও হাসি নেই। শোভার কথা কুশলও ভাবছে। তবে ওর একটা সুবিধে আছে, না হাসলেও লোকে বিশেষ কিছু বুঝবে না। ওর হাসি আর গম্ভীর ভাবের মধ্যে তফাত খুব কম।

পুরোহিতের মন্ত্র ভাল করে শুনছেই না বসুধা, শোভার কথাই ভাবছে। বিয়ে কাটলেই নতুন করে খোঁজা শুরু করতে হবে। ভাবনা শেষ হতেই দৃষ্টি টেনে নেয় বাড়ির গেট, যেখান দিয়ে ঢুকছে শোভা! নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছে না। সাদাটে শাড়ি পরেছে শোভা, যেন রাজহাঁস। জ্যোৎস্নাপুজোয় খাউচননদী পেরিয়ে আসছে।

পিঁড়ি থেকে উঠে পড়ে বসুধা। দৌড়ে গিয়ে শোভাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। কাঁদতে-কাঁদতে বসুধা দেখতে পায় কুশলের বাবা মাথা নিচু করে ট্যাক্সির কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। শোভাকে নিয়ে এসে বুঝি অপরাধ করেছেন খুব। উনি যে কতবড় উপকার করেছেন, নিজেই জানেন না! শোভাকে ছেড়ে কুশলের বাবার বুকে মুখ রেখে কাঁদে বসুধা।

শ্রীবাস এখন কী করবেন! বিয়েবাড়িতে এত গুরুত্ব তিনি চাননি। ছোট্ট একটা কর্তব্য সারতে এসেছিলেন। এখন সকলে তাঁকেই ঘিরে ধরেছে। নীলার বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাননি শ্রীবাস। নীলার বাবা জোর করেন ভিতরে আসার জন্য।

শ্রীবাস নীলার বাবাকে বললেন, "দাঁড়ান আসছি। ট্যাক্সির ভাড়াটা মেটাই।"

"ওসব আমরা দিয়ে দিচ্ছি। আপনি ভিতরে চলুন।"

শ্রীবাস বললেন, "ট্যাক্সিতে আমার একটা সুটকেস আছে, নামিয়ে নেবেন।"

শ্রীবাস চেয়ারে বসে বিয়ে দেখছেন, দৃষ্টি একটু সরতেই চমকে উঠলেন, খোকার মা না? পরমুহূর্তে বিভ্রম কাটল, শোভা বসে রয়েছে বেলার শাড়ি পরে। শ্রীবাসই দিয়েছেন। গভীর মমতায় বিয়ে দেখছে মেয়েটা। ওর হাবভাব বেলার মতোই জড়সড়।

বুকের একটা পাঁজর কনকন করে ওঠে শ্রীবাসের, সামান্য শাড়িতেই এতটা জীবন্ত হয়ে উঠল বেলা! একটু ভালবাসলে ওকে আঠারো বছর পেরিয়ে আসতে হত না। মানুষ মানুষকে আর একটু বেশি ভালবাসলেই...